জাল প্রতাপচাঁদ

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা,
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৪ নং বীডন্ ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

জাল প্রতাপচাঁদ।

বর্দ্ধমান রাজার গল্প।

১

পূর্ব্ব কথা।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জাল রাজার মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণ বাবু নাই, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টর নাই, সে মহিবুল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই, সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত থাকিলে থাকিতে পারেন, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জাল রাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র সেই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টি লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া

ঘরে ঘরে যেরূপ হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া, কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের "জয় হউক" বলিয়া তাহারা ভিক্ষা চাহিত। ভিক্ষুকদের গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণ বাবু, হয়ে কাবু, হাবু ডুবু খেতেছে" এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে শুনা যাইত।

মূল কথা; এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই জাল রাজার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। মোকর্দ্দমার সময় হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারি পর্য্যন্ত পথে ঠাসাঠাসী করিয়া দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত না, তাহারা গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। যে দিকে চাও, সেই দিকেই লোক, লোকের উপর লোক—পথে, গাছে, ছাদে। এত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মধ্য দিয়া জাল রাজাকে পদব্রজে কাছারিতে পাঠাইতে জেল-দারগার সাহস হইত না; সুতরাং পাল্কী করিয়া শত্রু সিপাহী দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাইয়া পাঠান হইত। তাহাতে কেহ জাল রাজাকে দেখিতে পাইত না, পাল্কীর ছাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। লোকে তাহাতেই তৃপ্ত হইত। নিঃশব্দে অতি গম্ভীরভাবে তাহারা তাহাই দেখিত, আর এক এক দিন একবাক্যে আকাশ পূরিয়া

তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত—"জয় হউক"। দশ সহস্র কণ্ঠধ্বনি একত্রে—সে গম্ভীর শব্দে যেন দশদিক শিহরিয়া উঠিত। বাঙ্গালী তখনও সজীব, তখনও দশ হাজার লোক একজনের নিমিত্ত একত্রে চীৎকার করিতে পারিত। পেনাল কোডের ভয়ে হউক, অথবা অন্য কারণে হউক এখন দশজন লোকের কণ্ঠ একত্রে স্ফূর্ত্তি হয় না। মানুষের নিমিত্ত একত্র চীৎকার আর শুনা যায় না, যাহা এখন শুনা যায়, তাহা ঝুঁব বাহকের চীৎকার—পথ হইতে লোক তাড়াইবার চীৎকার।

এখন সে সকল কথা অনর্থক। যাহারা জাল রাজাকে দেখিবে বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহারা জাল রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদালতে গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইত; কে কে সাক্ষী দেয়, কে কি বলে, শুনিয়া যাইত। যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের স্বাপক্ষ কথা বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে এক প্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত। একদিন একজন "মেছুনি" কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর শিরে আঁইশ চুবড়ি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব রটনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জাল রাজার স্বাপক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, তিনি কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন—মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাহাই তিনি কাল্‌নার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্য্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন! এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে কেমন একপ্রকার পবিত্র সুখ উদয় হইল। সে পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন" এ কামনা স্ত্রীলোক মাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতাপ-চাঁদ। তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার আসিবার কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপচাঁদকে বর্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, মেজেষ্টর তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহ্য হইল না। তাহাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল পরিচয় আনুপূর্ব্বিক দিবার অগ্রে, প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেন না, পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা

অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল। দুই একটি ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি সহজেই অনুভব হইতে পারিবে।

২

তেজচাঁদ বাহাদুর।

(বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা।)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথা সময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ, হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচাঁদ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ! হামরা লাল ঘবরাওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইল। এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপিষ্ঠ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদ্গীরণ করাইব, নতুবা কর্ম্ম

ত্যাগ করিব এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচাঁদ প্রথমে তাহা জানিতেন না; কিছু দিন পরে তাহা শুনিয়াছিলেন। মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইলে, তেজচাঁদ বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞাসাকরিলেন :—

"তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?"

মোক্তার। না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ দানের ফল পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না! টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার। ন্যূনকল্পে আর দুই হাজার চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ!—খবরদার!—দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে,তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম। কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিক দৃষ্ট হইবে। তিনি এক দিন একটী দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। তিনিই মহারাণী কমলকুমারী।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ,—তিনিই আমাদের এই গল্পের পরাণ বাবু।

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠী বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য

হইতে চাহেন না, পূর্ব্বরাজারা সেরূপ "এক ঘরের" মত থাকিতেন না। আপনাদের বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এদেশী প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখিতেন। তেজচাঁদ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, অনেকের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন; সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" জুটিল, তখন রাধামোহন বাবুর হাতে "কাতুর" ছিল; দুই প্রধান "দান" সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি" চলিল। ক্রমে দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক" উঠিল। রাধামোহন বাবু দেড় লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ "মাছ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড় লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্য্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ রাত্রে—কোথাও বা শ্যামা পূজার রাত্রে,—প্রমারা খেলাও অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এমন কি, কলিকাতার সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পর্ব্ব উপলক্ষে প্রমারা খেলিবার টাকা তাঁহারা জামাতাদের পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কেহ আর প্রমারা খেলে না, তথাপি প্রমারা খেলার টাকা তাঁহারা অদ্যাপি দিয়া

থাকেন। রাস যাত্রায় বা যে কোন যাত্রায় পূর্ব্বে যেখানে লোক সমারোহ হইত, সেই খানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোসুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ বাটীর উপর তালায়, নীচ তালায়, দালানে, বারাণ্ডায়, উঠানে—কোথাও আর স্থান থাকিত না, সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে চমৎকার! খেলওয়াড়রা চক্ষু নাশা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্রচিত্তে তাস টিপিতেছেন, একেবারে খুলিয়া দেখিতে সাহস হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে, পাছে "ফিগরু" সরিয়া থাকে! পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি, তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা, এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলটী Dramatic। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি, সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, মন্দগতিতে, কখন আইসে কখন আইসে না; সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য, এক দিনে, এক দণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ! আবার তাহার উপর অদৃষ্টের কুহক। প্রমারার অদৃষ্টের নাম "পড়্‌তা।" এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে

"ধূলা মুটা ধরিলে সোণা মুটা হয়"; প্রমারার পড়্তা লাগিলে যে কাগজ ধর, সেই কাগজেই তুমি জিতিবে। এক রঙ্গা ফিগুরু ধর, তুমি ফুরুস মারিবে; ফুরুস পাচার কর, ন্যূনকল্পে তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়্তা সম্বন্ধে স্পেন্সার (Spencer) বলেন, যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরাক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল একজন মন্দ পায়। মিথ্যা কথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও, ভাঁজিয়া দেও, পড়তা ঠিক থাকিবে; যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়্তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রমারা খেলার পক্ষপাতী নহি, বা সে জন্য এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রমারা খেলায় উন্মত্ত করে, দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায়, তাহা খেলওয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই, তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ খাইয়া যে অভাব পূরণ হয়, সেকালে প্রমারা খেলিয়া সেই অভাব পূরণ হইত। এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ হইতে জেলেমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর—কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি সে সময়ের Esthetic cultureর প্রধান সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিস এখন কিছুই নাই।

একালের পুঁজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, তাহা যে কিছুই নহে, একথা কেহ এখন বুঝিবে না, কাহার বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, তাহা জাতিগত ও সমাজগত। সে কার্য্যকারিতাশক্তি আমাদের কই? ইস্পেন দেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল, তখন তথায় সরবণ্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী ইলিজেবেতের সময় ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয়দেশের কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, উভয় দেশের নাটকপ্রসবিনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লেখালেখি হয়, তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গলা নাটকের মত কেবল বকাবকি আর হাঁকাহাঁকি।

সে সকল কথা এখন যাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষ বিবাহটি অতি বৃদ্ধ বয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

৩

কুমার বাহাদুর।

কুমার প্রতাপচাঁদের বালককালের কথা সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে, তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, ঘুঁড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ বলবৎ ছিল, একবার ঘুঁড়ির লক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁহার পীঠ কাম্‌ড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। সে চিহ্ন তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল। গোলকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন। এদেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের তাহাই হইয়াছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী নান্‌কী রাণীর কাল হয়। সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর আদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পায় নাই।

প্রতাপচাঁদ কোন অকার্য্য করিলে, রাণী বিষণকুমারীর ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা কহিতে পারিত না। অন্যের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং রাজা তেজচন্দ্র কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং কুমার বাহাদুর আলালের ঘরের দুলাল হইয়া দাঁড়াইলেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। এই বীজ অর্থাৎ এই দুর্দম ইচ্ছা, তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। ইচ্ছা দমন করিতে তিনি শিখেন নাই।

তাঁহার বিমাতা কমলকুমারী তাঁহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্রে কুমাতা, বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচাঁদকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে, এক দিন প্রতাপচাঁদ পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

সর্ব্বদাই প্রতাপচাঁদ আহ্লাদ আমোদে কাটাইতেন, তিনি হাসিতে বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাঁহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম হইত, পৌষমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্ম্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

৪

ছোট রাজা।

কুমার বাহাদুরের বয়ঃক্রম হইলে লোকে তাঁহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বালককালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস ও শক্তি অসাধারণ ছিল, সেই সঙ্গে আপনাকে রাজা বলিয়া তাঁহার মনে একটা দাম্ভিকতা সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত।

মোগলেরা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ বলিয়া প্রতাপচাঁদ তাহাদের ভাল বাসিতেন, কয়েকজন তাঁহার বডিগার্ড স্বরূপ রাজবাটীতে রাখিয়াছিলেন, সেই কয়েকজনের জমাদার—আগা আব্বাছ আলি—সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত, সেই ব্যক্তিকে

সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, একথা তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, একহারা অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ান-দিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালওয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্রিত হইতেন। তাঁহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবির লন, এবং আপনারা স্বয়ং কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এঅঞ্চলে ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেল গাছে উঠিতেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ প্রসাদাৎ ইদানীং বাঙ্গলায় কুস্তি (Gymnastic) আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের ভুল। ইংরেজি শিক্ষায় ও শাসনে বরং আমাদের [illegible]য়া গিয়াছে। প্রাতে বালকেরা স্কুলের পাঠাভ্যাস করে, [illegible]বকাশ থাকে না,

ইতর লোকেরা কুস্তি করিলে তাহাদের প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং কুস্তি করা রহিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইতর লোকদিগকে কোন কার্য্যের ভার দিলে, তাহারা তাল ঠুকিয়া সম্মতি জানাইত। এখন আর সে তাল ঠোকা নাই। কারণ সাধারণ লোকের মধ্যে আর সে কুস্তি নাই, সে বল নাই। অনেকের বিশ্বাস, আমরা চিরকালই এইরূপ দুর্ব্বল। যাঁহারা ইংরেজি গ্রন্থ পড়িয়া বাঙ্গালীর ইতিহাস শিখিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা আকেবর প্রভৃতির রুবকারী ইত্যাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মুসলমান আমলে বিস্তর বাঙ্গালী যোদ্ধা ছিল। বাঙ্গালার ফৌজ বাঙ্গালীরাই হইত, নবাবের পক্ষের যুদ্ধ বাঙ্গালীরাই করিত। পঞ্চহাজারি দশহাজারি যে সকল সেনাপতি ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন প্রজা লইয়া যুদ্ধে যাইতেন, সে প্রজা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহই নহে। সে দিন পলাসীর যুদ্ধে বাঙ্গালী জাঁদরেল আর বাঙ্গালী সেনা যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও ইংরেজ জাঁদরেলের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা একটী ইংরেজ সাহস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যদি সে দিন মিরজাফর ইংরেজদের স্বপক্ষ হইয়া হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত না করাইতেন, তাহা হইলে বাহাদুরির স্রোত আজ আর একদিকে বহিত।

এখন বাঙ্গালীর আর বলবীর্য্য নাই সত্য, কিন্তু তাহা বাঙ্গালীর দোষে নহে; রাজশাসনের দোষে। সে সকল কথা এখন অনর্থক।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে বড় পরিপক্ক ছিলেন। [illegible] কে বলে, তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। [illegible] আছে, তিনি না কি কোন একজন [illegible] অনেক

ইংরেজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিবিল সার্বেণ্ট হইয়া এদেশে আসে। এবং সেইজন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টর সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ক্রটী করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদের উপর ছিল, তাহাদেরই তিনি "বেয়াদব" বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, পল্টনের একজন ডাক্তার স্কট্ সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। আরও অন্যান্য ইংরেজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই আসিতেন, আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আর মদ খাইতেন। প্রতাপচাঁদ তাহাদের সঙ্গে মদ ধরিয়াছিলেন। মেদেরা মদ তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সহিত অনর্গল ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাঁহার শিক্ষক গোলকচাঁদ ঘোষ নিজে ইংরেজি জানিতেন না[illegible]থামস্ ডিস্," পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা ছিল।

তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলিনীপাড়ার রামধন বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুঁচুড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দিনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সীঙ্গুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্য বর্দ্ধমান প্রতি বৎসর যাইতেন, একবার এত ফাগ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন যে, পনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমন কালে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাব বাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয়ের দানপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

পরাণ বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে, এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা

ইংরেজকে বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সার্বেণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিবিল সার্বেণ্ট হইয়া এদেশে আসে। এবং সেইজন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টর সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি এইরূপ একটা সামান্য ত্রুটী করিয়াছিলেন, প্রতাপচাঁদের নিকট ইহা "বেয়াদবি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগাগোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদের উপর ছিল, তাহাদেরই তিনি "বেয়াদব" বলিতেন। অন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, পল্টনের একজন ডাক্তার স্কট্ সাহেবকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। আরও অন্যান্য ইংরেজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই আসিতেন, আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আর মদ খাইতেন। প্রতাপচাঁদ তাহাদের সঙ্গে মদ ধরিয়াছিলেন। মেদেরা মদ তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। ক্রমে অভ্যাসে প্রতাপচাঁদ তাঁহাদের সহিত অনর্গল ইংরেজিতে কথা কহিতেন। তিনি কখন ইংরেজি অধ্যয়ন করেন নাই বলিলেই হয়, তাঁহার শিক্ষক গোলকচাঁদ ঘোষ নিজে ইংরেজি জানিতেন না[illegible]ামস্ ডিস্" পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যা ছিল।

তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলিনীপাড়ার রামধন বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুঁচুড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দিনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সীঙ্গুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাগ খেলিবার জন্য বর্দ্ধমান প্রতি বৎসর যাইতেন, একবার এত ফাগ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন যে, পনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমন কালে বস্তা বস্তা ফাগ বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাব বাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া থাইতেন।

প্রতাপচাঁদ অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয়ের দানপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

পরাণ বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে, এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা

তেজচাঁদকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর পরাণবাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, "পরাণ মামা দড়ি পাকাচ্ছেন।"

পরাণ বাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায়, এই কথায় প্রতাপচাঁদ বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, "অষ্টম গর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হবে, যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, 'আমার গদিতে পরাণের পুত্র বসিবে; বরং তোমরা একথা লিখিয়া রাখ।" এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বীজ সেই অবধি রোপিত হইল।

পরাণ ব বুর সহিত প্রতাপচাঁদের অকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন।

কথিত আছে, ১৮১৯ সালের ৮ আইন, যাহাকে সচরাচর "অষ্টম" আইন বলে, তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, প্রতাপচাঁদ যেরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে বোধ হয় না যে,

তিনি বিষয় রক্ষার নিমিত্ত কোন উপায় চিন্তা করিবার সাবকাশ পাইতেন না। কিন্তু লোকে বলে যে, তিনি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে নিয়মিত দিনে সূর্য্য অস্তর মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদয় দিতে না পারিলে জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমিদারদিগের জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমিদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমিদার নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া লন, আমিও সেই মত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নীলাম করিয়া সেই নীলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব। এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নীলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারের জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চিরস্থায়ী দূরে থাক্, কাহার জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না।

এ অস্থায়ীত্ব লইয়া কোর্টঅব্ ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখা লিখি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসা থাক্, তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক, শেষ অবস্থায় কিছু দিন তেজচাঁদ বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটী জন্মিয়াছিলেন : কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। চারি পার্শ্বস্থ আর সকল যেরূপ, সেইরূপ হইলেই মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল, তাহাই টিকে, নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজের সকলেই অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিই টিকিবে, নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি হইবে; উচ্চপ্রকৃতির লোক, সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক্ একেবারে লোপ পাইবে। যেখানে সমাজ পবিত্র সেখানে ধর্ম্মিষ্ঠ ও পবিত্র লোকেই টিকিবে, সেখানে নীচ ও শঠ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে, এবং পরিশেষে লোপ পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, "যথা ধর্ম্ম তথা জয়," কিন্তু বাস্তবিক একথা সকল সময়ে সত্য নহে। তাহাই বলিতে হইয়াছে "কলিতে অধর্ম্মেরই জয়,

যে প্রবঞ্চনা করে, যে শঠতা করে, তাহারই উন্নতি।" মূল কথা, অধিকাংশ লোক যেরূপ, ফলও সেইরূপ হয়। যেখানে কিয়দংশ লোক ধর্ম্মিষ্ঠ সেইখানেই ধর্ম্মের জয়, আর পাপের পরাজয়, যেখানে অধিকাংশ লোক পাপিষ্ঠ সেইখানেই পাপের জয়, ধর্ম্মের পরাজয়। কৃষ্ণনাথ প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন, তাহা বলিতেছি না।

৫

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু।

প্রতাপচাঁদ আটাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে আহ্লাদ আমোদে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, তাঁহার মানসিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপরাহ্লে বারদ্বারীর ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, তথাকার একটী গেট হইতে কখন্ একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয়, দেখিতেন। তিনি আর সে ছাদে যান না, দূরবীণ স্পর্শ করেন না। রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে বহু ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদ বাবু নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাহারই সঙ্গে দুই একটী কথাবর্ত্তা কহিতেন, আর চিনারি নামে একজন ইউরোপীয় চিত্র-

করের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

কিছুদিন পরে ছোট মহারাজকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কেহ তাঁহার কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ রাজা বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি পুত্রকে অনাদর করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরও বিশেষ কষ্ট হইল। মনে করিলেন সেইজন্যই হয় ত তাঁহার প্রতাপচাঁদ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যে জন্য প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহা দুই একজন জানিতেন; কিন্তু কেহ প্রকাশ করিতেন না। কিছু কাল পরে, একজন মুসলমান আমলা মহারাজ তেজচাঁদকে গোপনে ছোট মহারাজার সন্ধান বলিয়া দিলেন। তেজচাঁদ বাহাদুর সেই সন্ধান পাইয়া প্রতাপচাঁদকে রাজমহল হইতে ধরাইয়া আনিলেন।

কিন্তু প্রতাপচাঁদ পূর্ব্বমত বিমর্ষ থাকিতেন, পিতা কত আদর করিতেন, কত বুঝাইতেন, কিছুতেই কর্ণপাত করিতেন না।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে, "আজ নূতন মহলে স্নান করিব," খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদয় ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্নে রাষ্ট্র হইল, প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপচাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার

নাম আসগর আলি, পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। কিন্তু পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে তথাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার কুলটার সাহেবকে আনিতে হইল। রাষ্ট্র যে, ডাক্তার সাহেব কোন ব্যবস্থা করিলেন না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি প্রতাপচাঁদের কপোল দেশে দশ বারটী জোঁক বসাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ রাজার ও প্রতাপচাঁদ উভয়ের আপত্তি হওয়ায়, ডাক্তার সাহেব রাগ করিয়া চলিয়া যান। তখনকার ডাক্তারদের সংস্কার ছিল, রক্তমোক্ষণ সকল রোগে নিতান্ত আবশ্যক। জোঁক তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিল, তাহাই ইংলণ্ডে ডাক্তারদের একটি নাম (Leech) অর্থাৎ জোঁক।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রতাপচাঁদ বলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা কর। পীড়া তখন সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কাল্‌নায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয়ং গেলেন। স্বসম্পর্কীয় অন্য কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই নহে, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা কেহই যান নাই। বোধ হয় তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে। কাল্‌নায় পৌঁছিয়া প্রতাপচাঁদ কয়েক দিন তথাকার রাজবাটীতে থাকিলেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরে, একদিন রাত্রি দেড়প্রহরের সময় তাঁহাকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। এবং কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হইল। সে সময় বিরক্ত

লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা মাত্র মশাল সেখানে জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোক ভাল হয় নাই। জলের ধারে একটী তাঁবু খাটান হইয়াছিল, পৌষ মাস, বড় শীত, আত্মীয় স্বজনেরা তথায় বসিয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর, শব দাহ হয়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই, রাষ্ট্র হইল প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচাঁদ তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক, প্রতাপচাঁদের সমাজ-মন্দির কাল্‌নায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে, কেহ মরিলে একটী নূতন মন্দিরে তাঁহার ভস্ম রক্ষিত হয়। প্রতাপচাঁদের সমাজ-মন্দির শুনা যায়, তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারী লইয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকর্দ্দমা বাধিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী; এবং সেইজন্য তাঁহারা দাবি করিলেন। এবং তদনুসারে জজ-আদালতে তাঁহারা ডিক্রি পাইলেন। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, শেষ তেজচাঁদের হাতেই বিষয় থাকে; রাণীরা মাসিক "তঙ্কা" পাইয়া নিরস্ত হন।

কিছুদিন গেলে, পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত, তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে, পোষ্যপুত্রের

কথা উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত হইলেন। এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে—সে অবশ্য আসিবে। তাঁহার আত্মীয়েরা বুঝাইলেন যে, তাঁহাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। এ সুখের ভ্রম নষ্ট করা উচিত নহে। কিন্তু যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন, বা তাঁহার আসিতে বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহ নাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন, তাহার একটী উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর, তেজচাঁদ বাহাদুর পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পরাণ বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—যেটী অষ্টম গর্ভের—সেইটী গৃহীত হইল। তাঁহার নাম কুঞ্জবিহারী কি নারায়ণবিহারী এমনি একটী ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাতাপচাঁদ রাখা হইল।

৬

আলোক শা।

পঞ্চদশ বৎসর পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বর্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ পছন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইয়াছে। কৃষ্ণসায়েরের পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজ-

বাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ফাক্তা, কুম্‌রী প্রভৃতি সাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে, এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসীও কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটী দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চূণকাম খসিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিন্তু রাজ-বাটীর জনকতক লোক, কি সন্দেহ করিয়া, সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বসিয়া থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিল, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, এ কথা সহরের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ বেগে রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিল। ছোট মহারাজের রাণীরা, বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য একজন

পুরাতন দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী ফিরিয়া গিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আর সে বর্ণ নাই, সে মূর্ত্তি নাই, কিন্তু গাল-ভরা সে হাসি রহিয়াছে। আহা! ছিলেন মহারাজাধিরাজ, আজ কি না সন্ন্যাসী! একেই বলে—'যে রাজ্যে রাজা ছিলেন, সেই রাজ্যে মেগে খেলেন।" রাণীরা চুপি চুপি চক্ষের জল মুছিলেন।

রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা দেখিতে আসিল। তাহা-দের মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ বাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।"* তারাচাঁদ সে কথা পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। তাহাদের উত্তেজনায় সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিয়া কাঞ্চননগরে গিয়া থাকিলেন; তথায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। পরাণ বাবু আবার তথায় লাঠিয়াল পাঠাইলেন, এবার লাঠি-য়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে, সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বহু যত্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার বাটীতে রাখিলেন। দুই তিন্ মাস পরে রাজা ক্ষেত্রমোহন পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান, মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টার সাহেব

* কুঞ্জবিহারী এই অপরাধের নিমিত্ত পদচ্যুত ও রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাইবেন, তখন পরাণ বাবুর লাঠিয়াল আর কিছুই করিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিলেন। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন না, সঙ্গেও কোন লোক লইলেন না।

এই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলায় জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটন। তাঁহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতেছেন; কোথায় দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিতেছেন, আর, নোট করিতেছেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজেষ্টারেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন যে "আর ঠকিব না; এবার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব।"

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাস না করিয়া সরকারী সরকিট হাউসের নিকট একটি তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল, মেজেষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা, বোধ হয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া

বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হোক্, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকিবেন, মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রসিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন এ কথাও লোকে শুনিয়াছিল সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন, এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারগা, জমাদ্দার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা অনেকেই পলাইল, তথাপি প্রায় এক শত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, এক জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল সাহেব গিয়া মেজেষ্টার সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টর নকল চাহিলেন, মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই. আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।" উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি? জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত দিয়া বলিলেন, চার্জের

নকল দেওয়া হউক।" মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমরা মফঃস্বলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে।" সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে, সন্ন্যাসী হুগলীতে প্রেরিত হইলেন, কেন, তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। হুগলীর দায়রায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। কৌন্সিলি টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না। তাহাতে টার্টন সাহেব রাগত হইয়া নিজামতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নিজামত আদালতে জজ সাহেবের হুকুম বাহাল থাকিল। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল কি কৌন্সিলি, কি মোক্তার কেহই থাকিতে পাইল না। জজ সাহেব একতরফা বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে ছয় মাস কারাবদ্ধের আজ্ঞা দিলেন; এবং খালাসের পর, চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচারপতি! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম।"

বিচারপতি বলিলেন, "তোমার নাম আলোক শা! তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ।" সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথারীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার

টাকা পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিয়া, ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে দিবস খালাস হইলেন, সে দিবস হুগলীতে মহাসমারোহ হইল। কলিকাতা হইতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। পর দিবস অর্দ্ধোদয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার বিস্তর লোক হুগলি ও ত্রিবেণীতে আসিয়াছিল; তাহারাও ঐ সমারোহে যোগ দিল। পঞ্চকোটের রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজা উভয়েই যোগ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, উভয়েই জেলখানার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ অঞ্চলের ধনবানেরা দেশী বাদ্য, ইংরেজি বাদ্য, হাতী,ঘোড়া,রেসালা লইয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জেলখানা হইতে জালরাজা বহির্গত হইলেন, অমনি হাতীর উপর হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল, দূরে কাড়ানাগরা বাজিতে লাগিল, চারিদিকে হরিবোল পড়িয়া গেল, তিন চারি দল ইংরেজি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলে জালরাজাকে মহা সম্ভ্রমে সুখাশনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাশন স্কন্ধে তুলিল, চারিজন বালক চামর ব্যজন করিতে লাগিল। শত শত পতাকা দুলিতে দুলিতে আগে আগে চলিতে লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন। বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাটীতে প্রথমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

৭

কাপ্তেন লিটিলের লড়াই।

কয়েক মাস পরে, আত্মীয় সকলের পরামর্শ অনুসারে আপাততঃ কলিকাতার সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে নালিশ মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীলশ্রীযুক্ত মাহাতাবচাঁদ তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব পিতা পরাণ বাবু, রাণী কমলকুমারীর পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত তিনি মদনমোহন কর্পূরাকে পাঠাইয়া দিলেন।

জাল রাজা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জোবানবন্দী হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, বাদী সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ। তার পর, বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল; সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে, একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা প্রমাণিত হইবে।

জাল রাজা বর্দ্ধমানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতা নিবাসী যাঁহারা তাঁহার জামিন ছিলেন, তাঁহারা এক বৎসর পূর্ণ না হইলে যাইতে নিষেধ করিলেন; জাল রাজা সুতরাং এক বৎসর অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর বর্দ্ধমান যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় উকীলদের পরামর্শ

মতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডেপুটি গবর্ণর এলেক্জাণ্ডর রশ সাহেবের নিকট একখানি দরখাস্ত করা হইল*। কিন্তু হ্যালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। †

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে, এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জাল রাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।‡ কালনা দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেক গুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঙ্গুরের শ্রীনাথ বাবু যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইয়া বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল রাজা সঙ্গে অধিক লোক লইলেন না; যে সকল ভৃত্যবর্গ প্রহরীরা তাঁহার পরিচর্য্যার্থ কলিকাতায় নিযুক্ত ছিল, কেবল তাহাদেরই লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না।

---

* *Extract from petition dated 15th. February 1838.*

"Your memorialist prays, therefore, that your Honor will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger, during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

† *Reply.*

The prayer of this petition cannot be complied with."

Fort William, March 5. 1838. (Signed) Fred. Jas. Halliday. *Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

‡ ইংরেজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাস।

রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েক খানি বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, চিড়িয়াখানার নৌকা, গাহকদের নৌকা, তাঞ্জামের নৌকা, এইরূপে ৪০ কি ৫০ খানা নৌকা একত্রে বাহির হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন, একথা পর দিন গঙ্গার উভয় কূলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তরে মাস্তরে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তথ্‌মাওয়ালা প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খড়ি খুলা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল, "যাও, বাছা! আপনার ঘরে যাও। কতদিন পথে পথে বেড়ালে এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তাঁহার কৌন্সিলি ও উকীল কেহই সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষায় তিনি এখানে সেখানে নৌকা রাখিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। চুঁচুড়ার অপর পারে জালরাজা প্রায় অষ্টাহ ছিলেন। নিকটবর্ত্তী মোগল, ফরাসিস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থানেই কালনার পুলিস আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ লয়। কে কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, কালনার জমাদার তাহার এত্তেলা পাঠাইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে

বর্দ্ধমানের মেজেষ্টারকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, জাল রাজা কালনা হইয়া বর্দ্ধমানে যাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* মেজেষ্টর সাহেব—ওগিল্‌বি—তাহা পাঠ করিয়াই কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ও দারগার উপর পরওয়ানা পাঠাইয়াছিলেন।

শেষ ২রা বৈশাখ † তারিখে জালরাজা কাল্‌নায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দুই জন মোক্তারকে বর্দ্ধমানে পাঠাইলেন। তাহারা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিবে যে, "প্রতাপচাঁদ কাল্‌নায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমানে আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।"

একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একত্রে আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন, কাল্‌না হইতে জাল রাজার দুই জন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছে। কি দরখাস্ত, তাহা তিনি অনুসন্ধান না করিয়া একবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টর সাহেব কাল্‌নার দারগাকে হুকুম দিলেন যে, "তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা হুকুম মাত্রেই আপনার সঙ্গিদের বরখাস্ত না করে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

---

* এই মিনিটের কথা সুপরিমকোর্টে জোবানবন্দিতে প্রকাশ পায়।

† ২রা বৈশাখ ১২৪৫, ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮।

ইতিপূর্ব্বে পরাণ বাবু জাল রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পিয়ারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কাল্নায় পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত, তাহা অতি গোপনে।

কাল্নায় একজন পাদরি থাকিতেন, তাঁহার নাম এলেক্জাণ্ডার, তাঁহাকে মেজেষ্টর সাহেব এক খানি স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়াছিলেন যে, জাল রাজা কাল্নায় পৌছিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন ও তাঁহার সঙ্গে কত লোক, তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানাইবেন। এ পত্রের সন্ধান পিয়ারা লাল বাবু জানিতেন, অতএব পাদরি সাহেবের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিলেন। সেই খৃষ্টান যাহা বলিত, তাহাই পাদরি সাহেব মেজেষ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না। এ কথা তিনি পরে জোবানবন্দিতে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কাল্নার দারগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত পিয়ারা লাল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারগা পুনঃ পুনঃ পিয়ারালালকে জানাইলেন যে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জাল রাজা কখন কাল্নায় পদার্পণ করিতে পারিবে না।"

দারগার নাম মহিবুল্লা। লেখা পড়া তিনি একবারে জানিতেন না. দারগাগিরি কর্ম্মে লেখাপড়া জানা অনাবশ্যক বলিয়া তখনকার মেজেষ্টার সাহেব প্রায়ই মূর্খদের এ কার্য্যে নিযুক্ত

করিতেন। দারগারা একজন করিয়া মুহুরি রাখিতেন, তাহারাই রিপোর্ট লিখিয়া দিত। দারগারা কেবল তাহাতে মোহর ছেদ্দ করিতেন। পিয়ারালাল বাবু মহিবুল্লার মুহুরিকে হস্তগত করিলেন।

জালরাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবামাত্রই যে, জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে, এ সংবাদ জাল রাজা কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই। সুতরাং "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি" ভাবিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকিলেন। কিন্তু কত দিন আর চুপ করিয়া নৌকায় বসিয়া থাকিবেন? একবার কাল্‌নায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখের প্রাতে বেলা ৮ টার সময়, নৌকা হইতে নামিবার উদ্যোগ হইল। তাঁহার সঙ্গে তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়া মহল ঘাটে গিয়া নৌকা ভিড়াইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা আসিতেছেন, আবালবৃদ্ধ সকলে পাথুরিয়া মহল ঘাটের দিকে ছুটিল। পিয়ারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন, পিয়ারালাল গিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন।" দারগা পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "ভয় কি, এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে নৌকা ভিড়ায়।" মহিবুল্লা দারগা বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেক চলিল। তাঁহার ইচ্ছা—সদর্পে চলেন, কিন্তু তিনি অতি স্থূলকায় * একটী প্রকাণ্ড

* "Mahiboollah, the worthy Darogah of Culna, the constituted authority, who can neither read nor write, nor walk nor run," *Petition to the Nizamut Audalut.*

মহিষাকার বলিলেই হয়, সদর্পে বা শীঘ্র চলা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। সুতরাং মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। মহিবুল্লা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণদিকে একখানি তরবারি রাখিয়া গেল।* আর একজন ছাতি ধরিল, তৃতীয় একজন আড়ানি ধরিল, অপর দুই জন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা সোটা ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকারিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাৎ, তফাৎ"—আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুই জন আরদালি তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আরদালি হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জাল রাজাকে দেখিয়া গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল, তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন; সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল। রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্ব কথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

---

* বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। জাতীয় ধর্ম্মানুরোধে হউক, অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাঁহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জাল রাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরি সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন ও মেজেষ্টর সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারের কথা, পাদরি এলেক্‌জাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে লিখিলেন যে, একশত তরবারধারী আর দুইশত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপ-চাঁদ কাল্‌না প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয়, তবে বোধ হয়, একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।*

পত্র পাইয়া মেজেষ্টার সাহেব, প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণ বাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে সমুদয় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একজন পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মেজেষ্টারেরা তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতেন। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সেই সময় স্মিথ্‌ সাহেব এই পদে ছিলেন। কিন্তু তিনি জালরাজাকে গ্রেপ্তার করিতে পরামর্শ কি হুকুম দেন নাই,

---

* My dear sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole length of Kalna in a *Tonjohn* with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6 or 8, 000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Dorogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am &c. A. ALEXANDER

তিনি কেবল লিখিয়াছিলেন যে, যদি জাল রাজা আপনার লোক বিদায় না করে, তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন লইতে পার।* মেজেষ্টার সাহেব এই পরামর্শ অনুসারে পূর্ব্বে পরওয়ানা জারি করিয়াছিলেন। জাল রাজাও তদনুসারে লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল এই মাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে, কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া বা দেখাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মেজেষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একবারে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন। নাজিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বদিন একটি পল্টন† বর্দ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া পত্র দ্বারা তাহার

---

*Extract from Superintendent's letter, No. 400, dated 28th. April, 1838.

"4th. The conduct of the claimant of the Burdwan Raj, appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in possession, that I think there is every reason to apprehend a serious affray. * *

"5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

"6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

† A detachment of 3rd Regiment N. I. under the command of Captain Little.

কাপ্তেনকে পথে আটক করিলেন। জজ সাহেব এই বার্ত্তা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে ডাক্তার চিক সাহেব কাল্‌নায় যাইতেছেন শুনিয়া আপনার দুইটী পিস্তলে স্বহস্তে গুলি পূরিয়া উভয়কে সাদরে দিলেন।

কাপ্তেন সাহেব পত্র পাইয়া সিপাহী সমভিব্যাহারে বৈঁচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার সাহেব একত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। জালরাজার সংবাদের নিমিত্ত মেজেষ্টারের আদেশ মত ডাক্তার সাহেব তথা হইতে কাল্‌নার পাদরিকে এক পত্র লিখিলেন। উত্তরে পাদরী ভয় দেখাইলেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ কাল্‌না যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কাল্‌নায় পৌছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী লইয়া পাদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেজেষ্টার একবার নদীর কূলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন; তাহার পর ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইবে। ওগলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা হইতে কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বিনা যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন। অতএব আপনি সসৈন্য সত্বর আসুন।" পত্র পাইয়া কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন অমনি সিপাহীরা বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গম্ভীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কলকল করিয়া ছুটিতেছে। এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে একখানি

পিনিস নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে; তৎপশ্চাতে চারি পাঁচ খানি বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পানসী ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাজিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে—সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও যেন ঘুমাইতেছে। এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মার, মার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুড়িলেন। অমনি গুড়্ গুড়্ করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌকার ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অপর মধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জালরাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরি চন্দ্র—নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে এক-স্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল। সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজির ও মহিবুল্লা দারগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজা, রাজা সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার আসা, সোণার সোটা, সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তাহা সকলই অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর, গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা, খেজমৎগার, যাহারা গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। দারগা, নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক। রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়, সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজির সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়া আনিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল। কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় নাই, সুতরাং তাহারা জালরাজার সঙ্গী বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারীতে সেই হতভাগ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়া, সূর্য্যি, গঙ্গামণি, অন্নু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনী, কন্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গম্মাঠাকুরাণী, দাসীঠাকুরাণী ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালানে গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারী ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। মন্দ সমাজের দোষ এই। যদি আমাদের সমাজ ভাল হইত, যদি আমরা নিজে ভাল হইতাম, আসাদ আলি ভাল হইতেন, মহিবুল্লা ভাল হইতেন, তাহা হইলে মেজেষ্টার সাহেব অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেন না। যেরূপ সমাজ, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট হইয়া থাকে।

সমাজের দোষে গবর্ণমেণ্ট মন্দ হয়, সমাজের গুণে গবর্ণমেণ্ট ভাল হয়।

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার জালরাজাকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারীতে লিখিয়াছেন যে, "তারা আর গুণমণি জাল রাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারযোগ্য।"

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জালরাজা আর নরহরি চন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জালরাজাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলির জেলে পাঠান হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়। তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন—না হয় অপরাধীর মত গেলেন। যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।' কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। সিপাহী-পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলিতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। নরহরিচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল, সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্তি ছিল, তাহা কোন কাগজপত্রে

প্রকাশ নাই। কেহ কেহ অনুভব করেন, পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হুগলির জেলখানায় পাঠাইতে হইবে।

জাল রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর, তাঁহার উকীল ডব্লিউ, ডি, সা (W. D. Shaw)—গ্রেপ্তার হইলেন। তিনি পূর্ব্বে জালরাজার সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই; লড়াইয়ের তিন চারি দিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। যে রাত্রে লড়াই হয়, সে রাত্রে সা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না—নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে গিয়াছিলেন; প্রাতে তথা হইতে আসিতে ছিলেন, পথে ওগলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। উকিল (British-born subject) প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন। মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তা-রের সময় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ? মেজেষ্টার সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজবিদ্রোহিতা (Treason!)"

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন—এমত নহে। পরে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ১৮৩৯ সালের ২৪মে তারিখের ৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে, "Persons accused of being conspirators against the Government, and of resistance to the constituted authorities."

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন—এই জনরব শুনিয়া পাই-গাছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার

একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আসামীর তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন বলিয়া সেই সরকারকে তৎক্ষণাৎ হাজতে যাইতে হইল। এবং সে ব্যক্তি যে হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটিও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিঙ্গুর হইতে একাকী বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সংবাদ মেজেষ্টার সাহেব কিরূপে পাইলেন। পাইয়া যথানিয়মে তাঁহাকে জেলে পূরিলেন।

তাহার পর, আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন। শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি, জাল রাজার স্বপক্ষ; অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের রামদীন্ সিংহ ও বল্লালদীঘির হাফেজ ফতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। আরও জন কয়েককে গ্রেপ্তার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু, পানিহাটির জয়নারায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েক জন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই।

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্তু একটা কাজ বাকি থাকিল। মেজেষ্টারিতে এত্তেলা গিয়াছিল যে, জাল রাজার সঙ্গে পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদের সেই সব অস্ত্র কোথায় গেল? নৌকায় পনরখানি তরওয়ার, ৩টি কি ৪টী বন্দুক আর একটি পিস্তল ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

দারগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ—তৎক্ষণাৎ কাল্নার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মেজেষ্টর সাহেবকে জানাইলেন যে,"সিপাহিরা সমস্ত তরওয়ার লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি বহুযত্নে তাহাদের নিকট হইতে পঞ্চাশখান মাত্র উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে, গাড়ী বোঝাই হইতে পারে।" কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলিতে পৌঁছিয়াছেন অনুভব করিয়া ওগলবি সাহেব হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে তরওয়ারগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবেন; কেন না সেই তরওয়ারগুলিই এই মোকর্দ্দমার প্রধান প্রমাণ।*

---

* Extract from a letter from the Acting Magistrate of Burdwan to the Magistrate of Hooghly, dated the 6th may, 1838.

"In my recent capture of *soi distant* Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys, however, of Captain Little's detachment considering them their fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp-followers did the same and my Burkundazes and Chowkeedars caught the infection, so that here are only now 86 swords forthcoming; of which upwards of 50 were received from sepoys * * As Captain Little is today at Hooghly, may I request you will join with him, if necessary, in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case"

৮

ওগলবি সাহেব আসামী।

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর, কলিকাতার ইংরেজি কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "The arrangements and preceedings of this officer (Captain Little) reflect equal credit on his judgmen and humanity." শেষ কথাটি বড় ঠিক!

জালরাজা সম্বন্ধে তাঁহারা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন। কোরিয়ার (Courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "There is a good chance of his closing his eventful career *an exalted character*. হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে,—উর্দ্ধে ফাঁসিকাটে ঝুলন।" লোকে ভাবিল, বিচার বটে! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জাল রাজা।

এই সময় কে একজন, সম্পাদকের ধমক দিয়া, হরকরায় লিখিলেন যে, "আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার নর্দ্দমা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল—ঘুমন্ত লোকের রক্ত। তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজেষ্টারের প্রশংসা করিতেছ। এই ঘটনা যদি আজ ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন?" এই পত্রের পর

সম্পাদকের সুর যেন একটু ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে,তখন মেজেষ্টারদিগের উপর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি এ কাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টারকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে উকীল সা সাহেবের কেরাণী জয়নারায়ণ চন্দ্র এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের (Writ of *Habeas Corpus*) পরওয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু সে পরওয়ানা ওগলবি সাহেব বড় গ্রাহ্য করিলেন না।

যতক্ষণ কথা হইতেছিল, বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নর্দ্দমা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টারের নিমিত্ত কোন ইংরেজের ভয় হয় নাই। কিন্তু যাই প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিম কোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টার অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। "The British inhabitants of Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Ryan may adopt on this occasion. On him will depend in a great measure the

degree of protection for life and property and freedom, Europeans *not in the service* may expect. If it be once ruled that a Company's servant can hold a writ of *Habeas Corpus* at arm's length, no man is safe"

কিছুদিন পরে মেজেষ্টার সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বেআইনি কয়েদ রাখার জন্য পুলিসে নালিস করিলেন। এই মোকর্দ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিমকোর্টের এটর্ণি ও কৌন্সলিদের মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। মফঃস্বলের অরাজকতা সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত। কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন, তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করায়, তাঁহারা ওগলবি সাহেবের নামে খুনের নালিস উপস্থিত করাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং তাহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হইল। তথা হইতে তিনি কি রিপোর্ট করিলেন আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে ছুটী দিলেন। এদিকে রাষ্ট্র হইল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস্‌পেণ্ড করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুপ্রিম কোর্টে হাজির

হইতে হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছিলেন। এবং যথা নিয়মে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেতনও দিয়াছিলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণবে যেরূপ দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবরা কোম্পানীর চিহ্নিত চাকর (covenanted servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল যে, আমরা এদেশেই হর্ত্তা কর্ত্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রিং কোর্টের উকিল কৌন্সলিরা কোন মোকর্দ্দমায় মফস্বল আদালতে আসিলে এই হর্ত্তা কর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘাত হইত, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাঁহারা কৌন্সলিদের ভুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানীর কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথেচ্ছ ক্ষমতা দর্শাইবার জন্ত কৌন্সলিকে কথন কথন তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতেন, আইনকানুন কিছু মানিতেন না, শুনিতেন না। সুতরাং কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা করিতেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ সম্ভ্রম পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিয়াছিল। এ দলাদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে কয়েদ করিতেন না। কিন্তু তাহা না করিলে, হয় ত কালনার হত্যাকাণ্ড কৌন্সলিদের অন্তঃস্পর্শ করিত না। কালনার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্সলিদের

উদ্যোগে। ওগলবি সাহেব যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলেন, তাহাও ইহাঁদের যত্নে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতেও পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেষ্টার ওহনলন সাহেব জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম কোর্টের জজ, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল। জজ, কৌন্সলি প্রভৃতি সকলেই "পরচুল (Periwig) পরিয়া স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিলেন। তখনও সাহেবদের মধ্যে পেরিউইগ পরার প্রথা ছিল। পিটার্ কোং (Pittar & Co.) তখন কলিকাতার মধ্যে প্রধান পেরিউইগওয়ালা। জুরি সকলেই ইংরেজ, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে এক জন বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আসামীর কৌন্সলি আপত্তি করায় তাঁহার পরিবর্ত্তে আর এক জন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি হাজির হইলেন। আর তাঁহার সে তেজ সে দাম্ভিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় দুর্ব্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে বসিতে এক খানি কেদারা দেওয়া হইল। তাঁহার মুখ দেখিয়া ইংরেজে পীড়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলে লোকে বলিত, ভয়ে তাঁহার মুখ শুখাইয়াছে। আসল কথা, যাহারা অত্যাচারী, তাহারা বড় ভীরু। যাহারা সুবিধা পাইলেই অত্যাচার করে, তাহারা ধরা পড়িলেই পায়ে ধরে। ওগলবী সাহেব বড় ভীরু ছিলেন, তাই তিনি এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, এবং ধরা পড়িয়া তাই তাঁহার মুখ এত শুকাইয়াছে।

তাঁহার পক্ষে কৌন্সলি প্রিন্সেপ। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সলি

লঙ্গবিল ক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাঁহাকে দুইজন সার্জন আর মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া হুগলি হইতে আলিপুরের জেলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে সার্জনের পাহারায় আদালতে আনা হইল। এবং যখন তিনি জোবানবন্দী দিবার জন্য দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন সার্জন তাঁহাকে ঠেসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া অনেকে হাসিতে লাগিল, সকলেই বুঝিল যে, হাকিমদের ভয়, পাছে জালরাজা তথা হইতে অন্তর্ধান হন, তাই তাঁহাকে সার্জনরা ঠেসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জালরাজা জোবানবন্দীতে বলিলেন:—"কালনায় এক দিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমায় গুলি লাগিয়াছে।' এই কথা শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পলাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলি মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে, আর আমি ডুব মারি। গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরওয়ার, তিনটি কি চারিটি বন্দুক, একটি পিস্তল, দুইটি কি তিনটি বর্ষা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসদ্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমি পলাইয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই, মৃত্যুর ভান করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা।"

জয়নারায়ণ চন্দ্র জোবানবন্দীতে বলিলেন, "আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলি করে, আমি তখন

নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। (বোম্বেটিয়ার ভয়ে) নৌকাযাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয়।

ভিকা সিংহ বলিলেন, "আমি ৩নং পল্টনের সুবাদার। গুলি করিবার পূর্ব্বে 'মারো মারো' হুকুম শুনিয়াছি। সে হুকুম কে দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু সাহেবরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।"

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, "আমি ঐ পল্টনের এন্সাইন্। কাপ্তেন লিটিল সাহেব মেজেষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'প্রতাপকে যেরূপে পারি, জীবিত হউক বা মৃত হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না।' ওগল্‌বী তাহাতে বলেন, 'হাঁ যেমন করিয়া পার, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, গুলি করিবার পূর্ব্বে মেজেষ্টার সাহেব 'মারো মারো' বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন। একবার গুলি করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল, রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছেন, তখন মেজেষ্টার বলিলেন, 'উস্কো গুলিসে মারো।' আবার গুলি আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল। পাদরী সাহেবও গুলি করিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। মেজেষ্টার সাহেব প্রথমে গুলি করেন।"

খোদাবক্‌স্ হাবিলদার বলিল, "গুলি করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয় ত তিনি গুলি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টার যে, 'মারো মারো' হুকুম দিয়াছেন, তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

কাপ্তেন লিটিন বলিলেন, "গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয়

নাই। সিপাহীরা ভুলে গুলি করিয়াছে। ওগলবী সাহেব গুলি করিতে হুকুম দিয়াছেন এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলি করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিন শত যোদ্ধা লোক (fighting men) ছিল। প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর, দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল।"

ডাক্তার চিক বলিলেন, "বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা করিয়া পিস্তল নিজ হাতে গুলি পূরিয়া দিয়াছিলেন। গুলি করিবার সময় মেজেষ্টার আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী এলেক্জণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনের গোরা ছিলেন।"

এইরূপে অনেকে সাক্ষ্য দিলেন, সে সকল লিখিবার প্রয়োজন নাই। বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেলে আসামী ওগলবির জবাব আরম্ভ হইবে, কিন্তু তিনি নিজে মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না। একখানি বর্ণনা পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন না। হুগলীর মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, তিনিই আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন।

এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, "আমি নির্দ্দোষী। কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য,

কিন্তু কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন, মেজেষ্টারের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন, পরাণ বাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জালরাজার পক্ষ হওয়াতে একটা গোলমাল বাধিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জালরাজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে। ও পক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি স্বয়ং গুলি করিয়াছি এবং "মারো মারো" বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চিক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জোবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক, যদি কেহ আমাকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ডবিধান হইবে, আমি তাহা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" *

তাহার পর আসামীর পক্ষে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজির, আর মহিবুল্লা দারগা ভিন্ন আর যাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, তাঁহারা কেহই কাল্নায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদের চার্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, "ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।"

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস্ দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে, "You now stand quite free from all charges and imputations, and if there

---

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূল মর্ম্ম মাত্র।

have been a little error of judgment, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদপত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

৯

সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলি প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জালরাজা আর তাহার সঙ্গী রাজা নরহরি-চন্দ্রকে দুই থানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিস দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে? গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিক্ষারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। যাহারা ছিল, তাহারা কেবল পরাণ বাবুর দলস্থ।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া, সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদব্রজে হুগলী পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবেন, বোধ হয়, ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেথানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জালরাজা সেইথানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটী সিপাহীর

দেয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চা'ল আনিয়া দিল। জালরাজা সে দিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জালরাজা ন-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন, আট দশ হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, দরিদ্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিখারিণীরা চা'ল আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দয়া। সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে এই সহস্র পুরুষ-অর্জ্জিত রত্ন লোপ পায় নাই; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে মুসলমানদের দয়া মজ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ-সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি,—দয়া a weakness—ভক্তি a weakness—স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত, তাহাই strength of mind। আবার যদি কখন আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পাল আবার হস্তান্তর হয়, তখন হয় ত বলিতে অভ্যাস করিব,—সত্যবাদ "বেওকুফি"; মিথ্যাবাদ "সিয়াস্তামি"; পরদ্রব্যহরণ "কর্ত্তব্য কার্য্য"; কেন না তাহাতে কখন কখন লাভ আছে।

সে সকল দুঃখের কথা যাক। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতাপকে তাহা দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহার নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ই মে তারিখে জালরাজা হুগলিতে পৌঁছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন,সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদীর ব্যবহৃত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছেন যে, সেখানি নিশ্চয়ই নূতন।

এই সময়ে হুগলিতে সামুয়েল সা[redacted] ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্ট[redacted] জালরাজা সন্ন্যাসিবেশে বর্দ্ধমানে [redacted] সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পরাণ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলিতে তাহাকে আপন হাতে পাইয়া আপ্যায়িত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাজা দরখাস্ত করেন। নকল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সামুয়েল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিন কতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেষ্টার সাহেব তাহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে; এক্ষণে সেই ব্যক্তিই এই জালরাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সোনাক্কের

জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া জেলখানায় গেলেন। তাহারা জালরাজাকে দেখিয়া ভাল সোনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়েল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জোবানবন্দী না লইয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইলেন। আবার [redacted] লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব [redacted], সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর, এই পত্রখানি তাঁহাকে লেখা হয়।

"Hooghly, Sept. 4, 1838.

"My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this

through Kali Nath Roy Chowdhery, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddi nath Roy is ! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hoormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly

E. A. SAMUELLS."

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন। তাহাদের জোবানবন্দী হইত, কিন্তু তিনি তাহা পড়িয়া সাক্ষীদের শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন যে, "সাক্ষীরা যাহা বলিত, তাহা অবিকল লেখা হইত না।" তাঁহারা আরও বলিতেন, "কোন কোন সাক্ষীর জোবানবন্দি জালরাজার অসাক্ষাতেও লওয়া হইত।"

হরকরা সম্পাদক হুগলিতে একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সামুয়েল সাহেব সেই ব্যক্তির নিমিত্ত রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক সদরলাণ্ড সাহেবের দ্বারা তাহা হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন, "হরকরায় যে জেবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টার সাহেবের মন-গড়া।" ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্তও হইয়াছিল।

সামুয়েল সাহেব বলেন; সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র, আর কিছু নহে।*

জালরাজার বিরুদ্ধে যাঁহাদের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা, তাঁহারাই ফরিয়াদীর সাক্ষী। সুতরাং তাঁহাদের জোবানবন্দী প্রথমে লওয়া হইতে লাগিল। তাঁহারা প্রায় অনেকেই বলেন, জালরাজা প্রতাপচাঁদ নহেন। হরকরা সংবাদপত্রে এই সকল জোবানবন্দী প্রথমেই ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। সামুয়েল সাহেব সেই

---

* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "A silly reporter was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished however, were so exceedingly incorrect that, Mr. Sutheland now principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura press, requested me to furnish him with my notes, in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course, I could have no objection, and the reports which appeared from that time, forwarded in the Hurkura, were the only reports which give a tolerable idea of the evidence, which was given in court. That there were many inacuracies even in these, is very probable, as Mr. Sutherland's leisure was not such as to enable him, in most instances, to give more than a general correction. কিন্তু জালরাজার উকিলেরা বলেন যে, "সদর্লণ্ড সাহেব যে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হরকরা আপিসে গিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন। সে রিপোর্টে যত কাটকুট বা নূতন লেখা থাকিত, তাহা সমুদয় সামুয়েল সাহেবের স্বহস্তের।"

জোবানবন্দী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন, আবার থানার দারগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার স্বাপক্ষ সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সমাচারদর্পণ সেইরূপ থানায় থানায় পাঠান হইল না। প্রথম জোবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে, জালরাজা সত্যই জাল। সুতরাং এই বিষয়ে লোকে সামুয়েল সাহেবকে দোষী করিতে লাগিল। কিন্তু সামুয়েল সাহেব বলেন যে, লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি সমাচারদর্পণ থানায় থানায় পাঠাইয়া দিতেন। ইহা ছাড়া কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে নহে।

১০

দায়রা সোপর্দ্দ।

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জালরাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন তিনি এজলাসে বসিয়া জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরিবোল হরি! কাল্‌নার জমিয়ৎবস্ত তবে কোন কাজের কথানহে! তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এ গুরুতর অপরাধের আবার জামিন

নাই। খুনের মোকর্দ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল; প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জালরাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে জালরাজার উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ফরিয়াদী?" মেজেষ্টার উত্তর করিলেন, "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" আবার সকলে অবাক্ হইল! প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ বাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট আঁকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারী সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপ-চাঁদের ছবি লিখিতেছেন, এ কথা সাহেব মহলে সকলে শুনিয়া ছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারী সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপ-চাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘ্যের যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্র-

করেরা দৈর্ঘ্যের যেন কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলির মেজেষ্টারিতে আনীত হইলে অনেকেই বুঝিলেন, ছবিখানি এ মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী—নির্লোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টার তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে। *

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ—একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন্—একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল—একজন সাক্ষী। ঐরাবতী নামক জাহাজে করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষীদের মহাসমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইল। প্রথমতঃ জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে; দ্বিতীয়তঃ, প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে; তৃতীয়তঃ, জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না এই সম্বন্ধে। কেবল এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জালরাজাকে দায়রা সোপর্দ্দ

---

* "Some curious evidence transpired concerning the "Portrait"that novel mute witness. * * The prosecution certainly seem to have unwittingly subpeonaed, in this portrait, a rather *hostile witness*. * * Long odds in favor of the Rajah and no takers. Prawn Babu is quite a *dark* horse, however; and may prove a winner."—*Hurkura 5th September* 1838.

করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কালনায় জমিয়ৎবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জালরাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, (যিনি বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন)। তৃতীয়, হাফেজ কতে উল্লা। চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, জুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরি চন্দ্র।

১১

দায়রার কার্য্য প্রণালী।

২০শে নবেম্বর মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষী দিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবের নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে বিগনেল নামে একজনকে পাঁচশত টাকা বেতনে ডিপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রেন্সার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমায় দায়-

রায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। বলা বাহুল্য যে, হ্যালিডে সাহেবই তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এই ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং এই ১৯শে তারিখে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল, আর ধার্য্যদিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করা হইল না।

কৌন্সলি মর্টন সাহেব জালরাজার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সেই দিন পত্রের দ্বারা জজ সাহেবের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সেপত্র পাইয়া ফরিয়াদীর উকিল বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অনুমতি দেওয়া যাইবে কি? বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন। উত্তর পাইয়া মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসামীর কৌন্সলি আসিয়া জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, "আসামী শারীরিক কিছু অসুস্থ আছেন, অতএব তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়।" জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

ফৌজদারি হইতে মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যে, রোবকারী আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজী ১১ টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেষ হইল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজী মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জজ সাহেব বলিলেন, "এখানে জোবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জোবানবন্দী আর পড়া অনাবশ্যক।" বিগনল সাহেবও জজ

সাহেবের কথায় সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী শ্রীযুক্ত মনসা-রাম মহাশয় বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না ; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজ পত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে।" জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। দেওয়ানজির যাহা ইচ্ছা, তাহা সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ পড়া হইল। (১) আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে। (২) সেই নাম ব্যবহার করিয়া ট্রেজরির দেওয়ান্ রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার নিকট টাকা লইয়াছে। (৩) বেআইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল। সে দিবস আর কোন কার্য্য হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১শে নবেম্বর) সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। জজ সাহেব বলিলেন, "আমার বোধ হয়, জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত। এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।"

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা

করিয়াছিলেন—একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর এক জন প্রধান সাক্ষী। বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার ট্রোয়ার সাহেব মেজেষ্টারিতে জোবানবন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, "আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।" অতএব তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। জালরাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, "ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য মোকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক।" ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানীতে অবশ্য দাখিল করিয়া থাকিবেন। সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাম করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পথ-খরচ পাঠান হউক।" এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন

না। শেষ কমিসন দ্বারা ডাক্তার সাহেবের জোবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল কিন্তু জজ সাহেব বলিলেন, "কমিসন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিমিত্ত, ইংরেজের নিমিত্ত নহে।"

কোম্পানির পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, "যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে।" কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাঁহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইতেন, বরং জজ সাহেব তাঁহাদের কটূক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে "গাধা" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষীর তালিকায় ছিল। তিনি নিত্য হুগলিতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জালরাজার উকিল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমীদারি, বিষয় আশয় সমুদয় এই জেলায়, শেষ কি বিপদে পড়িব?" এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০ শে নবেম্বর হইতে সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদীর পক্ষ যে সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী মেজেষ্টারিতে লওয়া হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিলাম। দায়রায় কেহ কিছু অতিরিক্ত বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ

করিলাম। আসামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে জোবানবন্দী দিয়ে দেওয়া হইল, তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল। মেজেষ্টারীতে বিচার হয় নাই, সুতরাং আসামীর পক্ষ কোন প্রমাণ তথায় লওয়া হয় নাই।

১২

সেনাক্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী।

ট্রাওয়ার সাহেব (C. T. Trower) বলিলেন, "আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকেদেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদুর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হ্যালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হ্যালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হ্যালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।' হ্যালিডে এখন কাশীতে আছেন।" দায়রায় বলিলেন যে, "আসামী কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

প্রিন্সেপ সাহেব (H. T. Prinsep, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন, "আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই, তাহার আকৃতি যেরূপ স্মরণ থাকে, প্রতাপের আকৃতিও আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে

প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না। (I should say that he was not Protap Chunder)। প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতাপের নাক চোক কিরূপ ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। দায়রায় বলেন যে, জেনেরেল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন হইল, তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।”

প্যাটল সাহেব (James Pattle, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, “১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছিলেন, স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।”

হাচিনসন্ সাহেব (Mr. Hutchinson) বলিলেন, “আমি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের একটীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপর দিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার কোল্টারের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জ্বর হইয়াছিল। দায়রায় এই সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই, কারণ তখন তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।”

বিচর সাহেব (John Beecher) বলিলেন, "আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাঁহার আকৃতি আমার স্মরণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একই রূপ লম্বা। দায়রায় এই সাক্ষীকে আর আহ্বান করা হয় নাই।"

ওবারবেক সাহেব (D. A. Overbeck) বলিলেন, "আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি। দিনামারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।" তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।" দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, "পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি উর্দ্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আর কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জেনারেলের এক জন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা

তেজচাঁদকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, 'আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই।' এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল। তিনি ওয়াটালুর যুদ্ধের পর, একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্ত বাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাঁতী কি বেণিয়ার বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন—রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। আমি এই আসামিকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকর্দ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে একব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটালুর লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টার সাহেব আমার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।" চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী, বিনা সওয়ালে বলিলেন। জায়রায় আসিয়া বলিলেন "প্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি

ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ কিনা, তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।"

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, "প্রতাপের সঙ্গে আমার দুই বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—একবার গবর্ণর জেনারলের দরবারে,—আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। সেখানে প্রতাপ ছদ্ম-বেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল। এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল।

হারক্লটস সাহেব (Gregory Herclots) বলিলেন, "আমি হুগলির সদর আমিন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখি-য়াছি, এখন দেখিলে, বোধ হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া তাহা বলিতে পারি না।" দায়রায় বলিলেন, "এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।"

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, "আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত তাহা হিসাব নিকাশ না করিলে বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপ-চাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি। ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না; কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন, 'ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।' গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন

তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হ্যালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন,'এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।' তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ড* ঐরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে লাহোরে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন; দুই একজন ইংরেজেও দিয়াছেন।" দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন, "পূর্ব্বে রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলির জেলে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তার হ্যালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ইনি যে নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

রাধামোহন সরকার (যাঁহার সঙ্গে পরাণ বাবু এক দল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন) গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন "প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যে ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত পা বড় বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবত্তর মহলের মোক্তার। আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।"

---

* জেনেরেল এলার্ড মহারাজ রঞ্জিত সিংহের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

বসন্তলাল বাবু বলিলেন, "আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টারীতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল।* এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।" দায়রায় বলিলেন, আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গালা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্ম গ্রহণ করেন।"

মোহনলাল বাবু বলিলেন, "আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে।" দায়রায় বলিলেন, "রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।"

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তঙ্খা পাই।" দায়রায় বলিলেন, "আমি পরাণ বাবুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন "আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি।" দায়রায় বলিলেন, "পরাণ বাবু আমার কুটুম্ব।"

* অনেকে বলেন যে যখন জালরাজার দাড়ি ছিল, তখন তাঁহার সহিত চিত্র পটের সাদৃশ্য হঠাৎ অনুভব হইত না, তাহাই রাজবাটী হইতে চিত্রপট আনীত হইয়াছিল। ধূর্ত্ত জালরাজা তখন সময় অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিত্রপটখানি আদালতে আনীত হইলে পর, তিনি দাড়ি ফেলিলেন। তখন সকলেই দেখিল, চিত্রপটের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট।

এইরূপে আর কয়েক জন জোবানবন্দী দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর সাক্ষী—পরাণ বাবুর চাকর।

১৩

সেনাক্ত সম্বন্ধে আসামীর সাক্ষী।

ডাক্তার স্কট সাহেব [*Robert Scott, 37th Madras Native Infantry*] বলিলেন, "আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া আমি ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্নই মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহার গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীত কালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামেন। আর প্রতাপের মত ইহাঁর হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিস্কার করা ইহাঁর অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহার বসিবার ভঙ্গী। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিলেন না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আর অভ্যাস নাই'। তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল

শুনিয়া কোন ভাষা শিখিলে এইরূপই হয়। পূর্ব্বের কথা আসামীকে দুই একটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আসামী আর কোন সাহেবের নাম করিতে পারিলেন না। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিলেন, 'একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুক্কুর মারিয়া বেড়াইতে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিলেন, 'বুলার সাহেব রঘুবাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘু বাবু তথায় বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরিয়া বিষের কথা বলিয়াছিলে।' এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ, মেদেরা মদ খাইতেন। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন, 'আমি আর মদ খাইনা, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি।' আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার (Trower) সাহেব থাকিতেন। আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সে দিন আমি আপিসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।

রিডলি [John Ridley] বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদের মত। আমি ইহাঁকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন আমি

কিছু বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, 'একবার একটি সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলে।' আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিন্সাল সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিয়াছিল? তাহাতে আসামী বলেন, 'রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয়।' এ সকল প্রকৃত কথা।"

বিবি হেরিয়াট বিটিং বলিলেন."আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষ রূপে চিনিতাম। আসামী নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাঁকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।"

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম। এই আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।"

জন মার্শল বলিলেন, " আমি ৭১ নম্বর সিপাহী-পল্টনের ব্রিগেড মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কিনা, তাহা আমি জানি না। তবে ২০ বৎসর কি ততোধিক হইল, ইহাঁর সঙ্গে ওয়ারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্র আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইহাঁকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইহাঁর অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাঁকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয়, ১৮২০ সালের পর, আর আমি ইহাঁকে দেখি নাই। তাহার পর ওগল্বির মোকর্দ্দমার সময় সুপ্রিম কোর্টে ইহাঁকে সাক্ষ্য দিতে দেখিয়াই আমার তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় যেন ইহাঁকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত, ইহাঁর

মুখের ছবি আমার প্যান্টুলনে আঁকিয়া লইলাম। সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর। ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর, গত কল্য ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়। তিনি ছোট রাজার সংক্রান্ত দুই একটি ঘটনা বলিলেন। আমার তখন স্মরণ হইল—ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু চুঁচুড়ায় যাহাকে ছোট রাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের রাজা তাহা আমি জানিতাম না।"

ফ্রানসুয়া সুলিমান (সাং চন্দননগর, জাতিতে ফরাসিস), বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুঁচুড়ায় যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট আট দশ বার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী—সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠী বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।"

হাজি আবু তালেব, চুঁচুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, "আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে থাকিত। আমি তথায় গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, প্রতাপচাঁদ মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য

লোক আমায় বলেন, যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিতেছি।

ডাক্তার জুলিয়ান নইটার্ড, সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসি ভাষায় জোবানবন্দী দিলেন,—"আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই ইঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সে দিন জেলখানায় ইহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আসামী আমাকে দেখিবা মাত্র চিনিয়াছিলেন।"

ফ্রেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন, "আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টার আমি নিজে আসামীকে চিনি না। সে দিন আমি ডাক্তার নইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন। তিনি এক দিন জেলখানার আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে ফিরিয়া গেলে তাঁহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড, বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়।" (এই জোবানবন্দীর পর অথচ মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে জেনেরেল এলার্ডের মৃত্যু হয়)।

গোলকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা, বলিলেন, "আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজি পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী সেই

ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আবার তাহার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।”

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, “আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি ইহাঁকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।

রামধন বাগ্দী বলিল, “আমি পল্‌তার ঘাটমাজি। এই আসামী মহারাজকে চিনি। ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাজি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল। সেখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, এক রাত কি এক দিন সেখানে থাকিতেন, ইহা আমি দেখিয়াছি।”

আমীর উদ্দীন আমেদ বলিলেন, “আমার নিবাস চুঁচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি চুঁচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি ইসাবেল আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুঁচুড়ায় আসিলেই আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।”

আগা আর্ব্বাস, যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত,

সেই ব্যক্তি বলিল, "এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ডেবিড হেয়ার সাহেব (David Hare) বলিলেন, "আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ছয় সাত বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এ দিকে একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষতঃ ছবির বাম দিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে, তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, আমার ভ্রম হইয়াছিল। আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় আসামীর সহিত দুই এক বিষয়ে আমার কথা বার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই, তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দূরবীণ লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া

কথা কহি!' এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীণ প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটী গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেখানে আসামীকে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহার মুখের উপরভাগ দেখিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু ঐ সময় ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া আমি ভাল চিনিতে পারি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেই খানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরবে শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, "আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম এবং এক একবার গিয়া দুই মাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই তেজচাঁদ বাহাদুরের পুত্র প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি প্রতাপের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর সাত আট বৎসর হইল, লাহোর-নিবাসী আমার একজন পাঠান দ্বারবান স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহের সহিত প্রতাপচাঁদকে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' আসামী প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল। আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তথায় তিন মাস রাখি। সেই জন্য বাঁকুড়ার

মেজেষ্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর অপমান করেন।”

জামকুড়িনিবাসী রাজা জয় সিংহ বলিলেন, “আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠীসম্ভূত। আমি আসামীকে চিনি, প্রতাপচাঁদ।”

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, “আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ। পূর্ব্বে আমি ইহাঁর চিকিৎসা করিয়াছি। আসগর আলি ইহাঁর বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে,প্রতাপচাঁদ মরেন নাই,পলাইয়াছেন।”

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, “আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ। ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি তখন ইহাঁকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম এবং পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদকে তাহা বলিয়াছিলাম।”

পিটর এমার সাহেব, ফ্রেজর সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী ও স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেক আসামীর পক্ষে এইরূপ জোবানবন্দী দিলেন। প্রতাপচাঁদের পিসী তোতাকুমারী, আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিলেন।

জোবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার একজন রাজা ছিলেন। জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইহাঁর জোবানবন্দী লওয়া হউক।” কিন্তু তাঁহার উকিল তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন “সোনাক্তসম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দ্দমার পক্ষে

তাঁহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না।” জালরাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকিল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “উপস্থিত ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় দেওয়ানির প্রমাণ অনাবশ্যক। যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাই অতি-রিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সোনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেও-য়ানী আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখনকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না। আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিস্ করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ?”

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন যে, গুটি কতক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্নে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জালরাজাকে আসামী ভিন্ন কখন মোকর্দ্দমায় ফরিয়াদী হইতে দেওয়া হইবে না ; এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জালরাজাকে ফৌজদারিতে আসামী করা হইয়াছিল। এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে করিয়া-ছিলেন যে, অন্য লোকে দেওয়ানি আদালতে যেরূপ নালিস করে, জালরাজাও সেইরূপ নালিস করিতে পাইবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত ! জালরাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয়—অচিন্তনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে।

১৪

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দবাবু, ভৈরব বাবু প্রভৃতি পনের জন জোবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগী এবং পরাণ বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপূর্ব্বিক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোট কথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে, ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্রি দেড় প্রহরের সময় কালনার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পাল্কী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়। তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। সেই শীতে প্রতাপচাঁদকে জলের নিকট রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল। তাঁবু সেইস্থানে জলের ধারেই পূর্ব্বে খাটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এ দিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহার অন্তর্জলী করা গেল। মোহন বাবু তাঁহার পা জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে, ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন। বাবলা ও চন্দনকাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময় ঘাটে দশ বারটা মসাল জ্বালা ছিল।

সাক্ষীরা এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়,

তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। কেহ বলিলেন, "তাহা স্মরণ নাই।" কেহ বলিলেন, "বধূরাণীদের মোকর্দ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রতাপচাঁদের মৃত্যু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই।" সাক্ষীরা এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জোবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন :—"The proof here is of the strogest description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses (fifteen in nnmber) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation, and who are consistent in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পনের জন সাক্ষীতে বর্ণন করিল, অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত সাক্ষীরা একইরূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

জাল রাজা জজকে বলিলেন, "পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস

ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।" জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জালরাজা স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, "যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংশে বুঝিতে পারিবে না।"

পীড়ার ভান সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য, তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই এক জন বলেন যে, মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন যে, এক সময় কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুই বার করিয়া দেখিতে যাইতেন। এক দিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "কতদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না; আমায় তোমরা বুঝাইয়া দেও। আমি দেখিতেছি যে, মনে করিলে আমি মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি।" সে স্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং আর একজন এপথিকারি ছিলেন, তাহার নাম স্ক্রাইন। এই কয়েক জন কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন। কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার

নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিষ্কার, তবে একটু ক্ষীণ। তাঁহারা পরস্পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর, কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তার বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন। আর স্ক্রাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল—শেষ তাহা একেবারে পাওয়া গেল না। হৃৎচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আর নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর, ডাক্তারেরা একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পণ ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিনজনে অনেক ক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি করিলেন, এ সময়ের মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চৈতন্য হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মরিয়াছেন। এইরূপে অনেক ক্ষণ গেল। তাহার পর, তাঁহারা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণেল সাহেবের শরীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী হইয়াছে। বুকে হাত দিলেন —হৃৎপিণ্ডের গতি আরম্ভ হইয়াছে। নাসায় হাত দিলেন—নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা অবাক্ হইয়া থাকিলেন। কেহ কিছুই

বুঝিতে পারিলেন না; অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকিল না। *

---

* ডাক্তার চেনি এই রূপ লিখিয়াছেন :—

"Colonel Townsend told us, he had sent for us to give him some account of an odd sensation he had for some time observed and felt in himself : which was, that composing himself, he could *die* or expire when he pleased, and yet by an effort, or some how, he could come to life again, which, it seems, he had sometimes tried before he had sent for us. We heard this with surprize, but as it was not to be accounted for, from now common principles, we could hardly believe the fact as he related it, much less give any account of it : unless he should please to make the experiment before us, which we were unwilling he should do, lest, in his weak condition, he might carry it too far. He continued to talk very distinctly and sensibly above a quarter of an hour about this (to him) surprizing sensation and insisted so much on our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his pulse first : it was distinct, tho' small and *thready :* and his heart had its usual beating. He composed himself on his back, and lay in a still posture some time : while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart, and Mr. Skrine held a clean looking-glass to his mouth. I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor Mr. Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth ; then each of us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover

এরূপ আরও দুই চারিটি ঘটনার কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা সেল্‌সাস সাহেব বলিয়াগিয়াছেন যে, একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন, তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

---

the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and unaccountable, and finding he still continued in that condition, we began to conclude that he had indeed carried the experiment too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine O'clock in the morning in autumn, as we were going away, we observed some motion about the body, and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning; he began to breathe gently and speak softly: we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him, and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars of this fact, but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it"—*Quoted by T. H. Tanner in his Practice of Medicine. 6th. Edition, Vol. I.*

* "The influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary, as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie

শুনা যায়, দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন, যোগীদের মধ্যে সে পদ্ধতির চর্চ্চা অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রচলিত। ভূকৈলাসের যোগী ও রঞ্জিৎ সিংহের যোগী এ কথার প্রমাণস্থল। লোকে বলে, তাঁহারা উভয়েই এরূপ সংজ্ঞাহীন হইতে পারিতেন যে, ডাক্তারেরা পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়াও জীবনের লক্ষণ কিছুই পাইতেন না। ডাক্তার ম্যাগ্রেগর সাহেব নিজে রঞ্জিতের যোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই যোগীকে এক সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া চল্লিশ দিন রাখা হইয়াছিল, চল্লিশ দিনের পর মৃত্তিকা খনন করিয়া সিন্দুক বাহির করা হইলে দেখা গেল, তাহার ভিতর যোগী সমাধি অবস্থায় আছেন—তাঁহার সংজ্ঞা নাই। ডাক্তার (Mc Gregor) সাহেব নাড়ী দেখিলেন—নাড়ী নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহার চেতনা হইল। ডাক্তার সাহেব "*History of the Sikh War*" গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"A Faqueer; who arrived at Lahore, engaged to bury himself for any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjeet naturally disbelieved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose

---

like a man void of life and sense. Carden used to boast of being able to do the same. But the most surprising example of this kind is the well known case of Colonel Townsend related by Dr. George Cheyne." *T. H. Tanner's Practice of Medicine 6th Ed, Vol. I, page 500.*

the Faqueer was shut up in a wooden box, which was placed in a small apartment below the middle of the ground; there was a folding door to his box, which was secured by a lock and a key. Surrounding this apartmet there was the garden-house, the door of which was likewise locked; and outside the whole a high wall, having its door-way built up with bricks and mud. In order to prevent any one from approaching the place, a line of sentries was placed, and relieved at regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights, at the expiration of which period the Maharajah, attended by his grandson and several of his Sirdars, as well as General Ventura, Captain Wade, and myself, proceeded to disinter the Faqueer. The bricks and mud were removed from the outer door-way; the door of the garden-house was next unlocked, and lastly that of the wooden box containing the Faqueer. The latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture. His hands and arms were pressed to his sides, and his legs and thighs crossed. The first step of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water. After this, a hot cake of atta was placed on the crown of his head; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the

tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward, and both it and the lips anoninted with ghee. During this part of the proceeding, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health. The legs and arms being extended and the eyelids raised, the former were well rubbed and a little ghee applied to the latter. The eyelids presented a dimmed suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation; the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatural temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to speak and at length uttered a few words in a tone so low and feeble as to render them inaudible. When the Faqueer was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstwation of joy."

হটযোগ অভ্যাস করিলে এ সকল ভেল্কী অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। জালরাজার তাহা অভ্যাস ছিল, এ কথা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জজ, উকিল প্রভৃতি কেহ তাহা বুঝিলেন না, সুতরাং বিশ্বাসও করিলেন না। খেচরী মুদ্রা দ্বারা শ্বাস রোধ করিয়া মৃত্যু অনুকরণ করা যাইতে পারে, এ কথা ইংরেজি বুদ্ধির অতীত—আমাদের বুদ্ধিরও অতীত। আমরা ইংরেজি গ্রন্থে সে সকল কথা দেখি না, সুতরাং সে সকল কথা বিশ্বাস করি না।

জালরাজার পীড়ার ভান সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, "প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, এ প্রতাপচাঁদ সত্যই জাল। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়। ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম যে, ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। কিন্তু মৃত্যুর ভান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিল। পরে এক দিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে জালরাজাকে বলিলে; জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, 'এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া থাকি।' তখন ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) সাহেব হুগলীর সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায়, তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, 'জালরাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না।'" এ কথা প্রকৃত হইলে, পীড়ার ভান করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সে কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "জামিন লইয়া জালরাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়।" জজ সাহেব কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিগ্নেল সাহেব বলিলেন যে, "জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত

তাহা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন।” জজ কার্টিস সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, তথাপি তিনি বলিলেন যে,“এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে।” আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। সা সাহেব সেইমত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই দিতে হুকুম দিলেন এবং কিছু দিন পরে নিজামত হুকুম দিলেন যে, “জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই।” কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, “এ অঞ্চলের লোকেরা জাল রাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল, এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহারা জাল-রাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং জালরাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।” নিজামত আদালত নিরুত্তর হইলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে পর, জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে এই সময় রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই—অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জালরাজার উকিলেরা জজ সাহেবকে বলিলেন “যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে, আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি?” জজ সাহেব সে কথার বিপরীত বলিলেন যে, “যখন প্রতাপ-

চাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন কেহ তাঁহাকে সোনাক্ত করিলে আর কি হইবে?”

মৃত্যু-ঘটনার হেতু জালরাজা এইরূপ বলেন :—

“বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।”

“আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম। শেষে, অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন ‘এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। এই সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে তুমি—মরিয়াছ।’ এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সে বার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীরউদ্দিন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া

আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এ বার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি— সকলে জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভান করিয়া কাল্‌নায় গেলাম। কাল্‌নার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রম বাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জলি করিল। অন্তর্জলির পর যখন রাজবাটীর অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল দুই চারি জন মাত্র আমার নিকট থাকিল সেই সময় আমি তাহাদের শপথ করাইয়া জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুর্‌শিদাবাদ যাত্রা করি।”

এই সময় রটনাও হইয়াছিল—রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রতাপ পলাইয়াছে—মরেন নাই।

১৪

জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না।

এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, যশোর জেলা নিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়ীতে আসিয়া একখানি কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিনযাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না, তিনি চাকুরি করিবেন, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারি করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদরি ডিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে পাদরি সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টার ব্যাটি সাহেবকে দেন। সেই সময়ে শান্তিপুরের দারগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারগাগিরি দিলেন। কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরি সাহেবকে লিখিলেন যে, "আমি শুনিলাম, কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; এবং তাঁহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকুরি দিতে পারিলাম না।" পাদরি সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে ডাকাইয়া বলিলেন যে,"তুমি আর কখন

আমার কুঠিতে আসিও না।" সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারি করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, "কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন।"

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল এই জালরাজা সাজিয়াছে। যখন জালরাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণ বাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরি ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সেবার জালরাজা আলক শা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল।

সেই সকল সাক্ষী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টি আঙ্গুল ছিল, আর বয়সে রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা কৃষ্ণলাল দশ বার বৎসরের ছোট ছিল।

এই মোকর্দ্দমার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে, "তাঁহার মৃত্যু হয়;" কেহ বলে, "তিনি আলিপুরের জেলে কয়েদ ছিলেন।" তাঁহার দুই সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় তাঁহার পিতা শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে।

গোয়াড়ির সাক্ষীরা জালরাজাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া কিরূপ সোনাক্ত করিল, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা গেল।

(১) ফকিরচাঁদ তেওয়ারি—নিবাস যশোহর।—বলিল, "আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।"

(২) ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, "আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসিপুত্র। যখন ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।"

(৩) গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, "এই আসামী আমার ভ্রাতষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৬৩ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানী আমি কাল্নায় থাকি, রাজবাটীতে উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের আঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা তাহা আমি বলিতে পারি না।"

(৪) রামচন্দ্র বিশ্বাস—আবকারীর এক জন খুচরা দোকান-দার, বলিল, "আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি।" (রাজা প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, "হাঁ বিলক্ষণ দাগ ছিল।" কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্ততঃ করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। সাহেব মনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন)।

(৫) পাল খ্রীষ্টান বলিল, "এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি

ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সোনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয়; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তখন করি নাই। তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্ত আমি দশ দিন সময় লইয়াছিলাম।" জেরায় বলিল, "গত রাত্রে মাণিক সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার নিকট পথ খরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।"

(৬) মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জোবানবন্দীতে বলিলেন, "এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল।" জেরায় বলিলেন, "আমি যখন মেজেষ্টার ও ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম বটে যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না, তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রামে।"

(৭) গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি—এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। ইহাকে গত ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিয়াছিলাম। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না বলিতে পারি না।"

(৮) রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, "আমি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর মুহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ

ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুয়ের বাসায় গিয়া থাকিত। যখন ঐ ব্যক্তি বৰ্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে, 'আমি ছোট রাজা,' তখন আমি কাহাকেও ইহার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।"

(৯) ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী পেস্কার। এই আসামীকে চিনি. ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।"

(১০) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, "এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন, আমি ইহাঁর চেলা হইয়াছিলাম। ইহাঁর সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বৰ্দ্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানাস্থানে বেড়াইয়াছি। আমি ইহাঁর পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইহাঁকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বৰ্দ্ধমানের রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমরা মশাগ্রামে ছিলাম। আপনাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাষ্ট্র করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তথা হইতে বৰ্দ্ধমানে গেলেন, আমি ও ইহাঁর ভ্রাতা গৌরলাল উভয়ে মশাগ্রামে থাকিলাম। আসামী বৰ্দ্ধমান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর, আমরা এক সঙ্গে বাঁকুড়ায় যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল,

* এলিয়ট সাহেব কমিসনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন এক দিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এই তেঁতুলতলায় জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি।" যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন, সুতরাং

আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিনমাস জেলখাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপায় না দেখিয়া মনে করিলাম মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া দিলে তিনি আমায় খালাস দিবেন। এই প্রত্যাশায় আমি তাঁহার নিকট দরখাস্ত করি। তিনি আমার এজেহার লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম 'কৃপানন্দ' ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর, পাদরি হিল সাহেব আমায় খ্রীষ্টান করিয়াছেন। আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি। তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি, তাহা বলিতে পারি না।" (অথচ এই সাক্ষী বলিয়াছেন, আমি জালরাজার পাদক জল খাইতাম)।

(১১) প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারি নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল। কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।" (এই সাক্ষীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা গল্প অদ্যাপি গোয়াড়িতে প্রচলিত আছে)।

(১২) নীলকমল ঘোষ বলিলেন, "আমি নদীয়া জেলার

তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে, জালরাজা বাঁকুড়া জেলায় বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার হন। এ জনরব কিরূপে জন্মিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, এই সাক্ষীর জোবানবন্দী দ্বারা এই রটনা হইয়া থাকিবে।

ফৌজদারি সেরেস্তাদার। এই আসামী, দেখিতেছি কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।”

(১৩) প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি নদীয়া জেলার জজ-আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি অদ্যাপি দাবি-করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।”

(১৪) হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, “আমি নদীয়া জজ-আদালতের উকিল। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।”

(১৫) ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে আমার নিকট অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।”

(১৬) মুন্সি মকিম বলিলেন, “কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী সে কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি, কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।”

(১৭) পাদরি ডিয়ার সাহেব (Revd. W. J. Deere) বলিলেন, “আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, পূর্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল, কৃষ্ণলালের চাকরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবকে কৃষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি সাহেব

তাহাকে চাকরী দেন নাই। ১৮৩৬ সালে (অর্থাৎ বাঁকুড়ায় মোকর্দ্দমার সময়) বর্দ্ধমানের পরাণ বাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা আমায় বলে, 'একবার হুগলী গিয়া জালরাজাকে সোনাক্ত করিতে হইবে।' তাহারা আমায় পথ খরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা লই নাই। আমি তাহাদের বলিলাম, 'যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও, তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান আনিয়া দিতে পারি।' এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্যামলাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব।' তাহার পর সে না আসায়, প্রায় পনর দিবস পরে, আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। এবার শ্যামলাল বলিয়া পাঠাইলেন, 'কৃষ্ণলালকে যদি পাদরি সাহেবের এতই দরকার থাকে, তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে।' আমি কৃষ্ণলালকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র ঊর্দ্ধমুখ ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখ। ১৮২১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রঞ্জিৎ সিংহের নিকট গিয়াছেন।"

(১৮) গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম। সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার

পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।”

(১৯) কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময় জজ সাহেব বলিলেন, “আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী”) সওয়াল মতে বলিলেন, “আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি. কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।”

(২০) রামধন খ্রীষ্টান বলিলেন, “আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে, আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।”

(২১) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, “আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল দারগা ছিলাম। কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে. তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।”

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোক মেজেষ্টারিতে বলিয়াছিল যে, “এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে,” দায়রায় তাহাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে, আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে, তাহাদের কথা বিশ্বাস-

যোগ্য নহে। প্রাণকৃষ্ণ খ্রীষ্টানের কথাও সেইরূপ। সে বলে যে, সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে, কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টী অঙ্গুলি ছিল।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, জালরাজা যে কৃষ্ণলাল, এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আরও বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজনও নাই। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শবদাহ যখন বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।*

---

* "Combining all their testimonies I cannot avoid the conclusion that the Prisoner's indentity is sufficiently established by a preponderance of evidence above whatever has been adduced to impeach it. Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration. Some dimness, and it may be doubt, will obscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered, I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the Law-Officer rejects the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's indentity with Kristo Lal * * * For the reasons which I have stated above, it appears to me, the identity is established by tolerably good, or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protab Chunder, it was, I think,

১৫

কাল্‌নায় জমিয়ৎবস্ত হইয়াছিল কি না ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টা-রীতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, কালনার জমিয়ৎবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েক-জন সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার চৌকিদারেরা সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতরাং তাহারা অনেকে অম্লান বদনে বলিল যে, কালনায় কোন জমিয়ৎবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন যে, কালনার জমিয়ৎবস্ত প্রমাণ হইয়াছে। "This charge, I view, is substantiated by the evidence of Mahaboollah Darogah and other Polish officers, and by that of Assadi Ali, the Burdwan Foujdary Nazir ; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, *first,* that the prisoner No. 1, the *soi-dissant* Rajah, did not disperse his

---

in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non-indentity remain, as I regard them firmly established, it would have been a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal." *Extract from No. 3 of the Calender for Sept. 1838.*

armed followers on receiving orders from the police officer to that effect, after the Darogah had explained to him the nature of the *Purwanah* or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. *Secondly*, that the prisnor No. 1 persisted in landing with a drawn sword in his hand, and visiting the shrine of Lalji Thakur at Culna; in the progress to which place, attended by a part of his followers, he ordered some of his people to disarm the two sepoys on guard at the burying ground of the Burdwan Rajah, ut on the remonstrance of the Darogah, he, at last, desisted from this foolish freak; after which, the *soi-dissant* Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

১৬

জাল রাজার নিজ কথা।

আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে তাঁহারা সোনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জালরাজা তাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ

সাহেব তাহাতে বলেন যে,তাঁহারা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে আসিলে কমিসন্ দ্বারা তাঁহাদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতে রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জালরাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না। তাহার কিছু দিন পরে, রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, "আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না।" ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, 'এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মানকেলি।' যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যাই জালরাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পরিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন।

লোকে যে যাহা বলুক, আমরা শুনিয়াছি যে, রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, "আসামীকে যদি বাস্তবিক ছোট মহারাজ বলিয়া আমরা চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। এবং হয়ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব?" এই জন্য তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করেন। তাহার পর যখন জালরাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত উপযাচক হইয়া দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল, তিনি সা সাহেবকে বলিলেন, "কাহার দ্বারা এ

দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।” সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, পরাণ বাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জালরাজা উকীলকে বলিলেন, এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন।” সে অনুরোধের অর্থ যে, তাঁহারা আমাকে সোনাক্ত না করেন। কিন্ত কি জানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।

জালরাজার এই কথামতে রাণীদের এত্রা করা হইল। তাহাতে জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, “আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাহাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।”

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা মুসলমানের সরা মতে হইত, সুতরাং সরার ব্যবস্থা দিবার নিমিত্ত এক জন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন। সেই কাজি, সমুদয় সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর, জালরাজাকে বলিলেন, তুমি মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই যে, এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন্ স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে?” জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার

উকিল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং বলিলেন, পোষকতা ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না, এবং প্রমাণেরও পোষকতার আর সময় নাই।" জালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন যে, "আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ্দ দিব।"

মোকর্দ্দমার শেষে তিনি এক দিন সেই ফর্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গলা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।"

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে অদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় একবৎসর থাকি। তাহার পর যৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বাণেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জ্বালামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থ স্থান পর্য্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর, আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল। যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়া-

ইতাম। যখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম। তাঁহারা এক স্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যে দিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই সেই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই। তাহার পর, বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্ত পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম,

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদাস্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন যে, "তাঁহার সেই ইয়াদাস্ত বহি জালরাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেইজন্য প্রতাপচাঁদের সমুদায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন।" কেহ বলে, "সে ইয়াদাস্ত বহি রাজবাটীতেই ছিল, মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।"

আমার বাক্‌রোধ হয় নাই। আমায় গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি এই সময় মধ্যে পোষ্য-পুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

আর এক কথা; আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্লেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়; কিন্তু মাথায় কেহ ছোট হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, লম্বায় চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই।

এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

১৭

দায়রার হুকুম।

অন্য সকল সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন তিনি বলিলেন যে, "সোনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে

প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না করা হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।" কিন্তু জজ সাহেব অন্যপ্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।" এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। সেই জন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন যে, "আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা সমুদয় প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, ন্যূনকল্পে তিন বৎসর।" এ সম্বন্ধে নিজামত যে হুকুম দিলেন, তাহা পরে বলা যাইবে।

১৮

অন্য আসামীদের প্রতি দায়রার হুকুম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলিতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলির মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল, তাহার

পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিন শত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ কথা নহে; সুতরাং সে দিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জালরাজা আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, "এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর।" সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "এই তিন শত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে?" জালরাজা বলিলেন, "আমি আর দেখিতে পারি না। তোমরা না কর, আমি নিজে দরখাস্ত করিব।" শেষ সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জালরাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এই মাত্র অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য। তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহাদের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।"*

---

* "Their whole crime consisted in believing me to be Rajah Protap Chand. If I am an impostor, as alleged, I am guilty of having deceived them, and I may therefore be liable to punishment. Of these persons only six have been thought criminal enough to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have committed, without being confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাতমাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে এক জন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল এক খানি করিয়া মুচলকা দস্তখত করাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের আর কোন বিচার হইলনা। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেই খানেই মরিয়া গেল।

বেআইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব ওগলবি সাহেবের নামে যে নালিস উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দ্দমায় হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর, ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি; বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলেখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে তাহাদের আনি নাই। আমার আদালতঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদা-

---

dead,—two more, I understand, are at the point of death, and twentytwo are in the hospital. *Extract from petition dated 30th November 1838.*"

লতে তাহাদের হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।”

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয়, সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, “ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে? তিনি তখন বলিলেন What do you mean by a trial? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said, are now, awaiting their sentence; those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already nndergone was sufficient;—they had been in prison six months— Yes! certainly without having any regular trial or sentence passed on him. By Regulation I cannot try after six months' imprisonment.

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! সেই জন্ত মেজেষ্টার বাহাদুর তাহাদের বিচার না করিয়া জেলে রাখিয়াছিলেন! যাহাদের বিচার করিতে নিষেধ, তাহাদের জেলে রাখিতে নিষেধ নাই! ছয় মাসের স্থলে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি

নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার করার সম্বন্ধে। ছয় মাসের পর, খবরদার যেন আর বিচার করা না হয়। ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কত দিন পরে খালাস পাইল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দ্দমার পর, মেজেষ্টার সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেষ্টারদের বোধ ছিল। গরিব দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহার সাহস হইত না। "চাচা আপন বাঁচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল। তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টার-দের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টার ছিল না, সবডিবিজন ছিল না, সকল কার্য্যই মেজেষ্টারকে নিজে করিতে হইত। সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসা-রাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে এই আসামীদের খালাস দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাত জন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয় জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টার সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন

নাই; দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই; সুতরাং জজ সাহেব তাহাদের খালাস দিলেন।*

এই ছয় জনকে কেন দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল; তাহাদের সকলকে সোপর্দ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয় জনকে কেন সোপর্দ্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জালরাজার উকিল সা সাহেব উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাহাই সাত জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।"

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা রায় নরহরিচন্দ্র এক জন আসামী ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল। এমন কি, তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্র অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরীশচন্দ্রও তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতিবৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরিচন্দ্রের দুর্দ্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রায় "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে গিরীশচন্দ্র বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপ কুরুচি ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এ পরিচয় দিলাম। রাজা গিরীশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি অন্যের দুর্ভাগ্য লইয়া রহস্য করিতে পারিতেন, এবং দেখিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

১৯

ওগিলবি সাহেব্ আবার আসামী।

একবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন। আবার তিনি আর এক মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্য সেই মোকর্দ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালনার হত্যাকাণ্ডের পর দিবস জালরাজার উকিল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময় বর্দ্ধমানের মেজেষ্টার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বেআইনি কয়েদের বিচার, এত দিনের পর, ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জষ্টিস্ সার্ এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগিলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্য্য দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চিফ্ জষ্টিস্ তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"James Balfour Ogilvy—It is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr Shaw. (The learned judge then recapulated the facts of the case) The Darogah a most important witness, as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either

party,—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence as to what took place, and whether Mr Shaw was party to any disturbance of breach of the peace. But I must say that there is not a tittle of evidence to show that Mr. Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only of one *Purwanah* being served on Protap * at Culna, and, I must say, that his conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular and proper. He made his client write a letter offering submission to the order of the authorities, and it was delivered to the Nazir that night. Mr. Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr. Shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact, and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable imprisonment. The Court will not however cause you to suffer imprisonment; because, we must suppose, that you have been actuated

* চীফ্ জষ্টিস সার এডওয়ার্ড রায়াণ সাহেব অম্লান বদনে "প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা" "প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ মেজেষ্টারগণ 'প্রতাপচাঁদ' নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জোবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা "soi dissant Rajah" প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জাল-রাজা" বলিয়া আসিতেছি।

by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal, but ardent wish to preserve peace and good order in your district. (The letters from Mr. Alexander the missionary and Captain Harrington were then read.) It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind, and after the importunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr. Shaw, but those letters should have led you to enquire into matters, before you proceeded to act as you have acted. It appears that there was on disturbance whatever when the affray took place nor had there been any for a considerable time before the event took place. But the Court believing, that you acted upon erroneous information, although rashly and unjustifiably, will give you in your sentence the benefit of that consideration, which they on that account extend towards you. Such conduct cannot, however, be lightly passed over. Liberty is dear to all ; you have deprived the prosecutor of his with very unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time be placed in situations similar in nature of yours. The sentence of the Court therefore is, that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged."

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে রায়ান সাহেব বলিলেন, "তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।"

কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টার অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ, তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে ওগিলবি সাহেব দাগী হইলেন না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টারির আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না। একটীন্ মেজেষ্টার ছিলেন, শীঘ্র পাকা মেজেষ্টার হইলেন।

২০

জালরাজা সম্বন্ধে নিজামত আদালতের হুকুম।

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জালরাজা সম্বন্ধে যে এস্তেমেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়। কালনায় জমিয়ৎবস্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, 'কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই।' এ বিচারের পর কালনার জমিয়ৎবস্ত

বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য।" এই সময় নিজামতের কাজি সাহেব তাঁহাদের উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, "মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক সা, ওরফে প্রতাপচাঁদ, ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।"

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দরখাস্ত করিলেন যে, "নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টারেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছেন যে, তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা আমাকে জেলে পূরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথাও যাইতে পারি নাই, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিব। এক্ষণে সে সকল অভিযোগ হইতে

হুজুর আদালত আমায় মুক্তি দিয়াছেন। বাকি যে অপরাধটি আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই; দিবার প্রয়োজন আছে, এমতও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাঁদ হইলেও হইতে পারি, এই সন্দেহ মাত্র ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব, এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, অন্য কেহ নহি, এই কথার প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ আমার উকিলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে এক প্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন। তাহার পর, আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।"

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন যে, "দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদালতে আপনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া

হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, "জালরাজার পক্ষে দেওয়ানী আদালতের দ্বার রোধ করিবার জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।" কেহ কেহ বলেন, "গবর্ণমেণ্টের কোন চতুর সেক্রেটরি এই কৌশল তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়াছিলেন।"

এই কৌশলের পর, জালরাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন, "The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shah, alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Brohmocharee."

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।—

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলক সা বলিয়া, কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে এখনও স্থির হয় নাই যে, আদালত হইতে ভবিষ্যতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী-আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে তাহার পূর্ব্বপরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বেআদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে, কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।"

২। "হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা (is a crime unknown to the English Law, as well as to the Codes of Law of civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law wide and sweeping as it is) কি বিলাতে,কি এদেশে কেহ জানিত না। অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেন না মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড এ পর্য্যন্ত কখন হয় নাই।"

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফঃস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।"

৪। "এখন তাহার মানস যে,একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপীল করে, অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা কোন কাগজ পত্রে পাইলাম না। বোধ হয়, দেওয়া হয় নাই। যে কারণেই হউক, বিলাতে আর আপীল হয় নাই। এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

যাহারা জালরাজাকে মোকর্দ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছিল যে, "গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক, এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না।" সুতরাং তাহারা হাত গুটাইল—কেহ আর টাকা কর্জ্জ দিল না। জালরাজার আশা ভরসা সকল ফুরাইল। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, সেই সন্ন্যাসী হইলেন।

২২

সাধারণের বিচার।

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালিরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিল যে, "জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ; এ বিষয়ে আর কণা-মাত্র সন্দেহ নাই।" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন?*" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, সে সময় পরাণ বাবু বর্দ্ধমানের রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজনা নিয়মিত সময় মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমিদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠান। লোকে সন্দেহ করিল যে, "পরাণ বাবু এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি জমিদারীর

হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দ্দমা চালাইবেন কেন? মেজেষ্টারদের

খাজনা দিতে পারেন নাই।" বোধ হয়, সেই জন্য বিস্তর ঘুষের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। এমন কি, ওগিলবি সাহেব খুনি মোকর্দ্দমার সময় বঙ্গে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "লোকে বলে আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়াছি।" পত্রখানি বঙ্গের সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল তাহার কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service, the whole of the profession was up in arms against me. They knew not of course the rights of the story, for that was an official secret. (এই কথাটি বাঙ্গালিরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him money (and he had contrived to raise enormous) have also deeply vowed to be revenged upon me, for all their schemes and hopes of all plunder have been defeated and these are the party who pay the expense of the proceedings against me, whilst the lawyers' conduct them, some of them positively acting without a fee contrary to all professional rule and precedent, the only reward they seek is to crush me if possible. It was by no means sufficient with them to vilify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder. * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * * The papers have it that I am suspended but that is not the case, I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary: and the Deputy

গোপনে পত্র লিখিবেন কেন? এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল করিবেন কেন? অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন যে, 'প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রঞ্জিৎ সিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন।' রঞ্জিতের স্বাপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাই গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার চাতুর্য্য করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।" এ সকল সন্দেহ যে অমূলক তাহা বলা বাহুল্য।

Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other. I understand that but for a blunder the case would have been dropped long ago. To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages in fourteen civil actions with which I was threatened; one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a consideration of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury. Finding they could make out no case they have given up all but two—contempt of the Supreme Court, and murder; and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr. Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it cows all the witnesses who have to give evidence for the prosecution." * * * এই শেষ কথা ওগিলবি মেজেষ্টার হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। জালরাজার সম্বন্ধে এ কথা আরও কত বলবৎ।

এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জালরাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্ম বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া এক প্রকার তৃপ্তিলাভ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীত, তাঁহারা ভাবিলেন, "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহা-পাপ করিয়াছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।" আর এক দল ভাবিলেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা; কেন না, যথা শাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

কেহ বলিল, "অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদৃষ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন, তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন?"

যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা খাঁটি হিন্দু, তাঁহারা ভাবিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্ব-জন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া থাকি-বেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন, "কেনা সাহেবেরা পরাণ বাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন।" তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, "ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন

সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইনি কাহার সাহেব?" অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার "কেনা সাহেব" থাকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত। তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারিতেন। "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এই মাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না. যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবদের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতি দ্রব্যাদি এদেশে অতি দুর্ম্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটী ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন, কিন্তু কর্জ্জ দুই চারি শত পরিমাণে নহে—একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ, এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার এই কর্জ্জ পরিশোধ করা অসাধ্য। এ কথা খাতক মহাজন উভয়ে জানিতেন, অথচ কর্জ্জ আদান প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন, "উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।" যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন, "আমি সময়ে সময়ে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব।" তখন পদে পদে লোকের বিপদ্ ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও

নাই। বাঙ্গালি-সমাজের স্রোত কিছু মন্দ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব' সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাহাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয় করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল। তাঁহারা স্বপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন। তাহা আইনি হউক, বেআইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা আর বড় পারেন না। এখন ধরাধরির ভয়, প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয়, কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি দেশী সংবাদপত্র ইহার মূল হেতু।

"কেনা সাহেবের" কৌশলে জালরাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যে চাতুরী করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং

কোম্পানির প্রাত সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল ; পাদরিদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল। তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কালনায় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল, সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যের মোকর্দ্দমা ফুরাণ করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলি সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর দুই একটী ধারা সন্নিবেশিত হইল। এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

২৩

জালরাজা ধর্ম্মপ্রণেতা।

মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জালরাজা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপ-চাঁদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিশেষ স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি জানি, গবর্ণ-মেণ্টের যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।" কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জালরাজার সহিত আত্মীয়তা

রাখিলেন, জালরাজা তাঁহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিতেন না। তাঁহাদের যত্নে জালরাজার অন্নকষ্ট—কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে তিনি দিনযাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন। তাহার পর, কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করে। তাহার একান্ত ধারণা ছিল যে, জালরাজা সত্যই প্রতাপ-চাঁদ।

কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন পরে, লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়িল। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দন-নগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিস্ আশ্রয়ে কয়েক বৎসর থাকি-লেন। তাহার পর, শ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল। শুনিতাম, তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসিয়া এক এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে "সে সময় বড় সমারোহ হইত।"

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জাল-রাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপ-

চাঁদ হইলে, এই দুর্ঘটনার পর, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কথাবার্ত্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা—সমুদায় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন। যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ফরাসিস্ politics, রুসদেশীয় রাজনীতি, পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, "বিলাতী রাজনীতিতে (European politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।" আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে, বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই এক জন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না যে, তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় সর্ব্বদা ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকগুলি বাবাজী তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয়, তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানুষিক শক্তি দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল যে, 'এ ব্যক্তি

সাক্ষাৎ দেবতা।" অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন; এমন কি, পঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বারুগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন, তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষা-প্রণালী, অর্চ্চনাপদ্ধতি নূতন প্রকার। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে।

এই নূতন ধর্ম্মটি ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা জালরাজার শিষ্যের সংখ্যা, বোধ হয় এখন বহু গুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু কেহই জানেন না যে, জালরাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাহারা উপদিষ্ট হইতেছে। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম সত্যনাথ।

২৪

জালরাজার মৃত্যু।

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল। যে দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সেই মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লিগ্রামে শিষ্যদের

দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যেরা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, একজন বদ্‌মায়েস্ মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়। সেই জন্য তাহারা সংকল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্‌মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিব! এখন সে সময় উপস্থিত হইল। "বদ্‌মায়েসের" সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর, যখন তাহারা অভীষ্টস্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানী তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা বলিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা

বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনাটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে বোধ হয়, তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন; তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন, কেহ বা আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।"

এই একার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রাডাঙ্গা পল্লিতে একটী সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

সমাপ্ত।

শ্রীবিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়

[illegible]